অশ্রুধারা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

পুস্তক-বিক্রেতা মিঃ এস, সি, আঢ্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ক্যাক্সটন প্রেসে শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১০।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

অশ্রুধারা প্রকাশ করিবার আমার ইচ্ছা ছিলনা। একদিবস আমার কোন বন্ধুর নয়নপথে পাণ্ডুলিপিখানি পতিত হয়। তিনি উহা আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া প্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমি আপত্তি করায় তিনি বিদ্রূপচ্ছলে বলেন, "আপনার গৃহলক্ষ্মী আপনার গৃহে এখনও সশরীরে বিরাজমান। ঈশ্বর না করুন, তিনি যদি আপনার পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবিত অবস্থায় তাহা জানিতে পারিয়া আপনার আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন। বিদ্রূপ যাউক, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে"র পর এরূপ উচ্ছ্বাসের আবরণে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা অন্য পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আপনাকে ইহা প্রকাশের অনুমতি দিতেই হইবে।" মিত্রবরের এবংবিধ যুক্তিতে আমি পরাজিত হইলেও তাঁহার প্রস্তাবে তখনও অনভিমত প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে আমাকে অবশেষে সম্মতিদান করিতে হইল।

অশ্রুধারা মুদ্রাঙ্কণের সময় আমি অন্যান্য অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ এরূপ ব্যস্ত হইয়া পড়ি যে, উহার প্রুফ সংশোধনাদি কোন কার্য্যই আমি স্বয়ং করিতে পারি নাই। এমন কি পুস্তকখানি লিখিবার পর আর একবার দেখিয়া উঠিতেও পারি নাই। কাজেই পুস্তকখানিতে যদি ভ্রমাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি যাহাতে স্বয়ং প্রুফ দেখিতে পারি, তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকখানি প্রায় তিন মাস পড়িয়া ছিল। অবশেষে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য, যে যে বন্ধুর আগ্রহ, যত্ন ও চেষ্টায় অশ্রুধারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থকারস্য।

অশ্রুধারা।
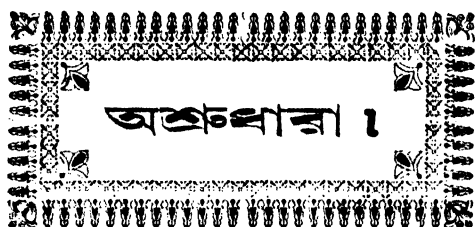
সে কোথায়?

কেহ কি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া আমার এই তাপিত প্রাণ শীতল করিতে পারেন? যাহাকে প্রাণের ভিতর রাখিয়াছিলাম,—যাহাকে অন্তরের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া, হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়া রাখিয়াছিলাম; যাহাকে না দেখিলে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতাম: মনে হইত,—বুঝি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড লয় হইল, সৃষ্টি স্থিতি নাশ হইল,—সেই প্রাণের প্রাণ, সেই হৃদয়ের আরাধ্য দেবী এক্ষণে কোথায়? বিপুল ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম; ভূধর শিখরে, কান্তারে প্রান্তরে, গভীর সাগরতলে পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলাম, কতবার কাতর কণ্ঠে সেই মধুর নাম ধরিয়া ডাকিলাম,

কিন্তু তাহাকে ত পাইলাম না, কেহত উত্তর দিল না! যত ডাকি— প্রতিধ্বনি বিদ্রূপচ্ছলে আমার শব্দেই তত্তই উত্তর দেয়, দিগঙ্গনা উপহাস করিতে থাকে, কিন্তু তাহাকে পাই না।

বলিতে পার কি ভাই, মানুষ মরিলে কোথায় যায়? তোমার দর্শন বিজ্ঞান, সাহিত্য কাব্য, ব্যাকরণ ভূগোল, ইতিহাস গণিত, তন্ত্র মন্ত্র কিছুতে কি আমার এই প্রশ্নের মীমাংসা দেখিতে পাও? যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে ভাই দয়া করিয়া বলিয়া দাও, সে আমার কোথায় গেল? সে যে নিমেষের নিমিত্তও আমাকে চক্ষের অগোচরে রাখিতে পারিত না, সে যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আমারই সেবা, আমারই মঙ্গল সাধনা করিত! সে যে আমা ব্যতীত কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিত না! সে যে জীবনে মরণে আমার সহিত প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। তবে সে আমাকে ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত দেশে কাহার নির্দেশে চলিয়া গেল? সে ত জানে, বুঝে,—আমার অস্থি মজ্জায়, আমার প্রত্যেক তন্ত্রীতে সে গ্রথিত। সে ত জানে, তাহার বিরহ বিচ্ছেদ, তাহার অদর্শন-অভাব আমার প্রাণান্তকর। জানিয়া শুনিয়া, এত ভালবাসিয়া সে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কেন?

যদি কেহ তাহার ভালবাসায় অবিশ্বাস করে, যদি কেহ বলে সে আমাকে ঐরূপ ভালবাসিলে কখনই পরিহার করিতে পারিত না, তাহা হইলে আমি তাহাকে নির্মম, নির্ব্বোধ, অবিশ্বাসী, ভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। লতিকা যখন বৃক্ষালিঙ্গন করে, তখন কি সে জানে, তাহার ঐরূপ প্রেমপাশ হইতে কেহ তরুবরকে মুক্ত করিতে পারিবে? কিন্তু মানব হস্তে তাহা সাধিত হয়। আমার সেই

নয়নানন্দদায়িনী সুবর্ণ লতিকা, সেই মণিমুক্তা-পরিশোভিতা মনোহর লতিকা যখন আমাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তখন জানিত না, নিষ্ঠুর কালের কুঠারাঘাতে তাহার প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হইবে,—তাহার সৌন্দর্য্য-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া কাল তাহাকে অকালে গ্রাস করিবে। আহা! সে কি যাইতে চাহে? সে কি ছাড়িতে সম্মত? তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। আমি পাপী তাপী তাহা জানি। সে পুণ্যবতী, সুতরাং তাহার সহিত আমার চির-সম্মিলন অসম্ভব, তাহাও জানি; তথাপি প্রাণ বুঝে না, মনঃ প্রবোধ মানে না। তাহাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিলে যেন কত যুগ যুগান্তর অতিবাহিত হইয়া গেল মনে হয়।

সে যে আমাকে ছাড়িয়া পলাইল, সে কি আমার দশা দেখিতে পাইতেছে না? দেখিতেছে না কি, তাহার অদর্শনে, তাহার বিচ্ছেদে ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে আকুল প্রাণে আমি অহর্নিশ কাঁদিতেছি, আর প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ডাকিতেছি? আমার এরূপ কাতরতা, এরূপ ব্যাকুলতা সে ত কখন সহ্য করিতে পারিত না। আজি তবে সে আসিতেছে না কেন? সে ত নির্দ্দয় মমতাহীনা বালিকা নহে? সে যে সরলতা কোমলতা, দয়া দাক্ষিণ্য, মায়া মমতার আধার! সে যে যখন তখন আমার গলা জড়াইয়া প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিত, "নাথ! আমি তোমারই।" এখন সে তবে আসিতেছে না কেন? আমার দুঃখে তাহার কি প্রাণ বিগলিত হইতেছে না? যদি না হয়, তাহা হইলে সংসারের এই অপূর্ব্ব লীলা, এই উৎকট রহস্য, এই প্রাণান্তকর ক্রীড়া, হে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার কি?

আমার মনে হয়, কেহ তাহাকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে, কেহ

তাহাকে অতি দূরে—কত লোকান্তরে—যেখানে মানব-কণ্ঠের কর্কশ স্বর প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে মায়া মোহের, সুখ দুঃখের সংস্রব থাকে না, সেই কি-জানি-কেমন দেশে—লইয়া গিয়াছে। সে ধাম দিব্য কি না জানি না। অন্যে দিব্য বলে বলুক, অন্যে তাহাকে স্বর্গ বলে বলুক, তথায় নন্দন কাননের পারিজাত কুসুমের সৌরভ অঙ্গে মাখিয়া সুশীতল মলয়ানিল মৃদুমন্দ গতিতে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে থাকুক, তথায় ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব থাকে থাকুক, তথাপি আমি তাহাকে দিব্য ধাম বলিব না। আমি স্বার্থের দাস, আমি বলিব, যেখানে আমার সেই প্রাণের প্রাণকে উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেখানে যদি আমার ক্রন্দনের রোল, কাতর কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা স্বর্গ নহে। সে আমার আর্ত্তনাদ শুনিলে কখনই স্থির থাকিতে পারিত না। ইহ-জগতের স্মৃতিনিচয় তাহার মানস-পট হইতে মুছিয়া না ফেলিলে সে নিশ্চয়ই আমার নিকট আসিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইত, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাকে দেখা দিত।

আমি পাপী, সে পুণ্যবতী; আমার স্পর্শে পাছে সে মলিন হয়, ইহাই যদি আশঙ্কার কারণ হয়, ইহাই যদি তাহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি ঐরূপ কারণ, ঐরূপ উদ্দেশ্য ভ্রান্তিমূলক বলি। অগ্নি পবিত্র, কাষ্ঠ অপবিত্র। অগ্নির স্পর্শে কাষ্ঠও বহ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। পুণ্যের আবির্ভাবে পাপের বিলয় হয়। পাপ পুণ্যকে অধিকার করিতে পারে না। পাপ অন্ধকার, পুণ্য আলোক, আলোকের উদয়ে অন্ধকারের বিলোপ চিরন্তন নিয়ম।

তবে তাহাকে, আমার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির যেখানে বিদ্যমান থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই দেশে লইয়া যাওয়া হইল কেন? তাহাকে এমন করিয়া অবরোধ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? সে কোথায় গিয়াছে, আমি তাহা জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারই উদ্দেশে মহাপ্রস্থান করিতাম। যদি জানিতাম, দেহ ত্যাগ করিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহার দাস হইয়াও সেবার অধিকারী হইব, তাহা হইলে এখনই যেরূপে হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু জানি না, মানুষ মরিলে কি হয়, কোথায় যায়! কেহ বলেন স্বর্গ নরক আছে, কেহ বলেন নির্ব্বাণ মুক্তি আছে, কেহ বলেন পুনর্জ্জন্ম আছে, কেহ বলেন পঞ্চ ভৌতিক দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া যায়, যে শক্তি প্রাণরূপে দেহে বিরাজ করিতে থাকে, তাহা বায়ুর সহিত মিলিয়া যায়, সুতরাং কোন চিহ্নই থাকে না। নানা জনের নানা মত। এসম্বন্ধে কত আলোচনা আন্দোলন, তর্ক যুক্তির অবতারণা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; অথচ একাল পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসা হইল না। কখন যে হইবে, তাহাও মনে হয় না। মরিয়া যদি কেহ ফিরিয়া আসিত এবং মৃত্যুর পর কি হয় বলিত, তাহা হইলে আমাকে এই গোলোক-ধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। তাহা হইলে নির্জ্জনে একাকী বসিয়া নয়নাসারে বক্ষঃস্থল ভাসাইতাম না; তাহা হইলে অক্ষম, অজ্ঞানের ন্যায় পড়িয়া থাকিতাম না, তাহা হইলে আমার সেই জীবনের সম্বল, যৌবনের সহচরী, সুখদুঃখের ভাগিনী, নয়নের মণি যেখানে গিয়াছে, হাসিতে হাসিতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইতাম।

জানিনা পরকাল আছে কিনা। ইহকাল আছে দেখিতে পাইতেছি,

হৃদয়ের পরতে পরতে বুঝিতে পারিতেছি। মানবের যদি পাপ পুণ্য থাকে, যদি কর্ম্মফলের কোথাও বিচার হয়, তাহা হইলে ইহকালে এই সংসার-ক্ষেত্রেই হয়। এখানে ভূপতি ভিখারী হইতেছে, কুটীর-বাসী মুকুটধারী হইতেছে, নানাজনে নানাকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছে। যদি মানবকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে না হইত, তাহা হইলে সকল মনুষ্যেরই এক অবস্থা হইত নাকি? মানবের এই অবস্থা-বিপর্য্যয়, এই নানারূপ দশা কেন হয়? আমি কাঁদিতেছি অন্যে হাসিতেছে কেন? আমি মরুভূমিতে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে ছটফট করিতেছি, অন্যে মনোহর সরোবরের সুশীতল পানীয় পাইয়াও সুখী নহে কেন? কেহ শিবিকা-বাহক কেহ শিবিকারোহী, কেহ প্রভু কেহ দাস, কেহ প্রার্থী কেহ দাতা এবংবিধ অবস্থান্তর ঘটে কেন? পূর্ব্বজন্মের এবং ইহজন্মের কর্ম্মফল যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ সকল ঘটিত কি? কেহ কেহ বলেন এই যে কর্ম্মফল, ইহা মনুষ্যের ভোগ্য নহে। কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা; তিনি হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া যেরূপে নিয়োজিত করিতেছেন, মনুষ্য তদ্রূপ করিতেছে। মানুষের নিজের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। মানুষ যাহা করিব মনে করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কখনই তাহা করিতে পারে না। আমি আহার করিব বলিয়া আসনে উপবেশন করিলাম, আহার্য্য প্রস্তুত, গ্রাস উত্তোলন করিতেছি, এমন সময়ে হস্ত অবশ হইল, আহার্য্য মুখে পর্য্যন্ত উঠিল না, শরীর স্পন্দহীন হইল, প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। আমি যদি আমার কার্য্যের কর্ত্তা হইতাম, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবে কেন? আমি কর্ত্তারূপে আহার করিতে বসিয়াছিলাম। সমস্তই উদ্যোগ হইয়াছিল, তবে আহার করিতে পারিলাম না কেন? আমার মুখের

গ্রাস মুখেই রহিল কেন? এইরূপ জীবনের সকল কার্য্যেই, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে আমার কর্তৃত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, আমি যদি কর্ত্তা না হই, আর একজন অদৃশ্যে থাকিয়া যদি সর্ব্বকর্ম্মের বিধাতা, নিয়ন্তা হন, তাহা হইলে আমি কর্ম্মফল ভোগ করি কেন?

কেহ বলেন আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য; আত্মার সুখ দুঃখ ভোগ হয় না, আত্মার বিনাশ নাই। এই আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগই তপস্যার উদ্দেশ্য—মোক্ষফল। ইহার নিমিত্তই সাধনা। যাহারা বিবেকবিমূঢ়, তাহারাই আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ মনে করে, আত্মাকে সুখ দুঃখের বিষয়ীভূত বিবেচনা করে। কিন্তু ইহা প্রকৃত তত্ত্ব নহে। মনুষ্য যেরূপ পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তদ্রূপ এক শরীর ত্যাগ করত অন্য শরীরে প্রবেশ করে। বস্ত্রের সহিত মানব-দেহের যে সম্পর্ক, দেহের সহিত আত্মারও সেই সম্পর্ক। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা দেহের উৎকর্ষের প্রতি বিশেষ যত্নবান হন না, আত্মার উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হন। আত্মা যতই পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী হইবে, আত্মার ততই মঙ্গল।

কেহ বলেন, নির্ব্বাণমুক্তির কথা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। নির্ব্বাণ নাই। যতক্ষণ ভৌতিক জগতের সঞ্চালন আছে, সৃষ্টিস্থিতি লয় হইতেছে, ততক্ষণ কোন দ্রব্যেরই নির্ব্বাণ নাই। গতিশীল জগতে সমস্তই গতিমান। কালের কঠোর আবর্ত্তে পতিত হইয়া ভূতের সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ ঘটিতেছে, তাহাতেই সৃষ্টি-স্থিতির বিলয় সংসাধিত হইতেছে। এ গতির কর্ত্তা সেই অসীম শক্তিমান জগদীশ্বর। তিনি নিজের নিয়মে নিজে বাধ্য।

এই গতির আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। কালচক্র বিঘূর্ণিত হই-তেছে, ভূতেরও তাহাতে অবস্থান্তর হইতেছে। আজ যাহা পঞ্চভৌতিক মানব দেহ, কল্য তাহা ভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত। আবার নূতন আকারে সৃষ্ট হইবে। ইহার ব্যতিক্রম কেহই ঘটাইতে পারে না। পরকাল-বাদীরা কর্ম্মফলের যেরূপই দোহাই দিউন, ইহাই অবিসংবাদী সত্য।

এইরূপে নানাজনে নানামতের অবতারণা করিয়াছেন। এ সকলের মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই, পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটাণুকীট; আমি এ সকল যুক্তি তর্কের ধার ধারি না। আমার হৃদয়মন্দিরে যাহাকে রাখিয়া দিবানিশি পূজা করি, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে পাইলে ধরাকে স্বর্গ জ্ঞান করি, যাহার অদর্শনে পৃথিবী শূন্যময় দেখি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিঘূর্ণিত হইতেছে মনে হয়, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়; আমি জানিনা সে কোন্ দেশে কাহার উদ্দেশে গিয়াছে। যদি সেদেশ জানিতাম, তাহা হইলে এখনি যাইতাম। কিন্তু সেত এদেশ জানে। সেত জানে, এদেশে তাহার বিরহে আমার কি দশা হইতে পারে। সেত কখনও নির্দ্দয় প্রাণে আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই, যাইতে পারিত না। কয়েক দিবসের বিচ্ছেদ ঘটিলে যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইত, দুঃখের সাগরে ভাসিত, ব্যাকুল প্রাণে আমাকে দেখিবার জন্য কত চেষ্টা ও যত্ন করিত, সে এদেশ জানিয়া, আমাকে চিনিয়া আসিতেছে না কেন? তবে কি তাহার ভালবাসার গভীরতা ছিল না? তবে কি সে প্রণয়ের প্রতিদান করে নাই? ছি! ছি! এ সন্দেহ, এ প্রশ্ন পশু ব্যতীত কেহ করিতে পারে না। যাহার তিলমাত্র হিতাহিত-জ্ঞান আছে, বিবেকের সামান্য দংশনও যে অনুভব করিতে পারে,

মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া সে কখন এত সন্দেহ, এত অবিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না।

সে আমায় ভালবাসিত। তাহার শোণিতের প্রত্যেক গতিতে, তাহার মুখের প্রত্যেক ভঙ্গিতে, তাহার চক্ষের প্রত্যেক ভাবে, তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক সঞ্চালনে প্রীতিপ্রেম বিকশিত হইয়া উঠিত। সে দেবী, ছলনা কখন জানিত না। আমার সামান্য বেদনা উপস্থিত হইলে, সামান্য ক্লেশের সঞ্চার হইলে, সে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তাহার অবসান করিতে সচেষ্ট হইত। এখন কাতর প্রাণে, করুণকণ্ঠে কতবার তাহাকে ডাকিতেছি, সে আসিতেছে না কেন? কি এমন মহা অপরাধ করিয়াছি, কি এমন ঘোর নারকীয় কার্য্য করিয়াছি যে সে ঘৃণা করিয়া, তাচ্ছিল্যপূর্ব্বক আমাকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেল? যদি তাহাই করিয়া থাকি, যদি মহাপাপী বলিয়াই তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে আমাকে এরূপে ত্যাগ করিল কেন? স্পষ্টভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, এই জ্ঞান-দেশের কোন নিভৃতস্থানে ত থাকিতে পারিত; কিন্তু সে ত তাহা করিল না। সে ত বলিল না যে, সে আমাকে ভালবাসে না। যখন যায়—যখন চিরনিদ্রায় অভিভূত হইবার উপক্রম করিতেছে, তখনও স্পষ্ট বচনে, তখনও গণ্ডদেশে অশ্রুবিন্দু ধারণপূর্ব্বক বলিল, "নাথ? চলিলাম, বিদায় দাও।" ইহাত রোষের, অভিমানের কথা নহে? এই প্রেমোচ্ছ্বাসে, এই বিদায়-প্রার্থনায় কত কথা নিহিত আছে, কত ভাবের সমাবেশ আছে, তাহা অন্যে বুঝিতে না পারুক, আমিত বুঝিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে ত্যাগ করে নাই—কোন অজ্ঞাত বলে তাহাকে আমার অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

তবে সেও কি আমার ন্যায় কষ্ট অনুভব করিতেছে? শুনিয়াছি, মানুষ স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলে সূক্ষ্ম দেহে সর্ব্বগামী, সর্ব্বজ্ঞানী হয়। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে সে আমার নিকট আসিতেছে না কেন? এই যে নির্জ্জনে একান্তে বসিয়া দিবা নিশি তাহাকে ডাকিতেছি, তাহার প্রেমময়ী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতেছি; তাহারই ধ্যান ধারণায় কালাতিবাহিত করিতেছি, ইহাত সে জানিতে পারিতেছে; তবে সে আইসে না কেন? এক একবার মনে হয়, সে এখন সুখদুঃখের অতীত, সে এখন স্বর্গের দেবী। সুতরাং তাহার ক্লেশাদি কিছুই নাই।

ভাল, স্বর্গের দেবী হইলে কি করুণাময়ী হয় না? আমার দুর্দ্দশা দর্শনে তবে তাহার করুণার সঞ্চার হইতেছে না কেন? তবে কি আমি তাহাকে ডাকার মতন ডাকিতে পারিতেছি না? তাহাই হইবে। নতুবা সে যে আমার প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, প্রীতির উৎস, প্রণয়ের আধার, স্নেহের মন্দাকিনী। সে যে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। সে যে সর্ব্বগুণের আকর। সে আসিবে না কেন? ওগো তোমরা কেহ বলিয়া দিতে পার কি, আমাকে শিখাইয়া দিতে পার কি, কি মন্ত্রে, কি স্বরে, কি প্রাণে, কিরূপ দেহে, কিরূপ অবস্থায় তাহাকে ডাকিলে ডাকার মত ডাকা হয়,—তাহার কর্ণকুহরে আমার কাতর স্বর প্রবেশ করে? করজোড়ে মিনতি করিতেছি, কেহ জানত বলিয়া দাও। আমার প্রাণ যায়, দেহ অবসন্নপ্রায়, ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে, আমি প্রাণপণে ডাকিতেছি। ইহা যদি ডাকার মতন ডাকা না হয়, যদি অন্যরূপ ডাকা কিছু থাকে, এবং কেহ জান, পায়ে ধরি, আমাকে তাহা শিখাইয়া দাও। আমি সেই রতিরূপিনী মনোরমাকে একবার দেখিয়া, একবার তাহার অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া, একবার তাহার

মনোহর দেহ সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, একবার তাহার অঙ্গসেবিত বায়ু স্পর্শ করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করি, দেহ স্নিগ্ধ করি—জীবন সার্থক করি।

কৈ! কেহত কোন উত্তর দিলে না। সকলেই নির্ব্বাক, নিরুত্তর। আমার অসময় দেখিয়া সকলে কি মৌনী হইয়াছ? ভাই! অসময় সুসময় চিরকাল থাকে না। তোমাদের মতন আমারও একদিন সুসময় ছিল। যখন চাঁদের কিরণে, জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনীতে, কুসুম সৌরভে, পবন হিল্লোলে মনঃপ্রাণ প্রফুল্লিত হইত। যখন প্রিয়া-পার্শ্বে বসিয়া সুরলোক তুচ্ছ মনে করিতাম, চরাচরকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতাম। হায়! সেই একদিন! আর আজি একদিন। চিরদিন সমান যায় না। আমারও এই অসময়ের হয়ত অবসান হইবে, আবার প্রিয়-সম্মিলনে সুখী হইবার আশা ফলবতী হইবে। তখন চন্দ্র হাসিবে, বৃক্ষলতা কুসুমস্তবক উপহার দিবে—বিহঙ্গ কূজনে—ভ্রমর গুঞ্জনে—সমীরণ সঞ্চারণে—প্রবাহিনীর স্বর-লহরীতে আমারই সুখের কথা—আনন্দের কথা—প্রীতি প্রফুল্লতার কথা প্রচারিত হইবে। তখন হৃদয়ের ঘন তিমিররাশি কাটিয়া যাইবে—শরতের নীল নভো-মণ্ডলের ন্যায় আমার হৃদয় গগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবে।

সত্য বটে, এখন আমার দুঃসময় হইয়াছে বলিয়া যাহা কিছু এক দিবস আনন্দদায়ক ছিল, তাহাই ক্লেশের নিদানভূত হইয়াছে। এখন শশধরের উদয়ে, ফুল্ল ফুলকুলের সৌরভে, মলয়ানিলে—প্রাণের ভিতরে আগুণ যেন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, স্মৃতির দহন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। আশার মধ্যে, "চিরদিন কখন সমান না যায়।" যাহা নল, শ্রীবৎস প্রভৃতির হইয়াছিল, সামান্য মনুষ্য যে সে ভাগ্য লিপির

বৈপরীত্য করিতে পারিবে, তাহা স্বপ্নেও বিশ্বাস করা যায় না। আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আশাতেই জগৎ-সংসার চলিতেছে। আশা না থাকিলে এ সংসার মরুভূমি হইত, সৃষ্টি স্থিতি বিনষ্ট হইত। কুহকিনী আশা, আমার অন্তরে থাকিয়া বলিতেছে, ইহ জগতেই হউক, আর পর জগতেই হউক, আমার সেই প্রাণেশ্বরীর দর্শন একবার পাইব, আবার মিলিত হইব। সে বন্ধন, সে মিলন কেহ আর ঘুচাইতে পারিবে না। উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ অতিবিস্তৃত মরুস্থলে ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় আমার এই বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ে মাঝে মাঝে যখন আশার এই ক্ষীণ জলধারা বহিতে থাকে, তখন প্রাণে এক প্রকার অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। যখনই ইহা বিলুপ্ত হয়, তখনই প্রাণ দগ্ধ হইতে থাকে, "সে কোথায়" বলিয়া অধীর হই।

———০:০:০———

নিয়তি।

যখন তাহার জন্য অধীর হইয়া কাঁদিতে থাকি, তখন আত্মীয় স্বজন আসিয়া সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করেন; বলিতে থাকেন, "সমস্তই নিয়তি। তাহার ভাগ্যে যাহা ছিল, ঘটিয়াছে, তোমার ভাগ্যে যাহা আছে ঘটিতেছে। ভাগ্য ব্যতীত আর পথ নাই।" যাঁহারা এইরূপ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদানে অগ্রসর হন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবৎ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাকে এই অধীর প্রাণে কাঁদিতে হইবে, ইহাও ত ভাগ্য; সুতরাং ইহার নিবারণের নিমিত্ত তাঁহাদিগের ভাগ্যের দোহাই দেওয়া কেন? জানি না, কি ভাগ্য এবং কি ভাগ্য নহে। মানব যদি ভাগ্যাধীন হয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কিছু না থাকে, তবে প্রাণসমা প্রেয়সীর, বা নয়ন-পুত্তলি পুত্রের মৃত্যু চক্ষের সম্মুখে হয় কেন? কেহ কাঁদে এবং কেহ হাসে কেন? একস্থানে বৃদ্ধা জননীর নয়নের মণি, জীবনের সম্বল, গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানকারী, একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের বিয়োগ ঘটিতেছে কেন? আবার একস্থানে নবজাত পুত্রসন্তানের পবিত্রতাপূর্ণ, সরলতাময়, সুন্দর বদন সন্দর্শন করিয়া জনক জননী আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে কেন? নিয়তির এমন চক্র কেন? লোকের অবস্থার এত তারতম্য কেন? কেহ যদি নিজের পুরুষকারের জন্য দায়ী না থাকে, যদি কর্ম্মফলের কথা অলীক স্বপ্ন হয়, তাহা হইলে ভাগ্য মানিতে হয়। কিন্তু ভাগ্য মানিলে এই অবস্থান্তর, এই জাগতিক নিয়মনিচয় প্রহেলিকাপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, জগতের রহস্য উদ্ভেদ করা দায় হইয়া পড়ে।

মানিলাম, ভাগ্যই প্রধান। স্বীকার করিলাম, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ঘটনাবলী—যাহা হইয়া গিয়াছে, যাহা হইতেছে, —যাহা হইবে, তিনি পরিজ্ঞাত। ঘটনাশৃঙ্খল স্থির না থাকিলে তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। এই ঘটনাশৃঙ্খল কি ভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরাত জানি না। জানি না বলিয়াই পুরুষকারের আশ্রয় লই। ঘরে বসিয়া থাকিলে কেহ আহার্য্য যোগাইয়া দিবে না। শাস্ত্রেও তাই পুরুষকারের কথা লিখিত আছে। যদি পুরুষকার মানিতে হয়, যদি পুরুষকারকে ভাগ্যাধীন না করা হয়, তাহা হইলে কর্ম্মফল ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা কর্ম্ম ফল মানেন, তাঁহাদিগকে পুরুষকারের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা পুরুষকারকে ভাগ্যাধীন বলেন, তাঁহারা পুরুষকারকে স্বীকার না করিলেও পারেন। কারণ, যখন ভাগ্যই প্রবল হইল,—তখন অধীনের বল কোথায়?

যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, তাঁহাদিগের কথা মানিয়া লইয়াই বলিতেছি, আমার ভাগ্যে কি আছে জানি না। জানি না বলিয়াই তাহাকে পাইবার জন্য এত সাধনা করিতেছি; কি জানি, যদি ভাগ্যফলে তাহার দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। কি জানি, আমার কাতরতায় যদি তাহার দয়ার উদ্রেক হয়, যদি আবার তাহার কর-কমল-স্পর্শে আমার তাপিত দেহ শীতল হয়। আমার ভাগ্যে কি আছে, তাহা কি তোমরা বলিয়া দিতে পার? যদি না পার, তবে বৃথা স্তোভ বাক্যে, বৃথা সান্ত্বনায় আমাকে কেন ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছ? বিধাতঃ! অধীনের ভাগ্যে কি কেবল ক্রন্দনই লিখিয়াছিলে? জীবনাকাশে ক্ষণেকের নিমিত্ত বিজলীচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া আবার তাহা

ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিবে, তাহা কে জানিত? যদি কর্ম্মফল না থাকে, তবে আমার এ ভোগ কেন হইতেছে? মানব না হইয়া, যদি হিংসা, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বিবেক, বিদ্যা, প্রভৃতি পরিশূন্য কোন অচেতন পদার্থ হইতাম, ইহা অপেক্ষা তাহাও যে শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল। যদি মানব জন্মই দিয়াছিলে, তবে সেই স্বর্গের দেবীকে —সেই প্রেম-প্রতিমাকে নয়নের সম্মুখে আনিয়াছিলে কেন? যদি আনিলে, তবে পুনরায় গ্রহণ করিলে কেন? সমস্তই যেন স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। এত ভালবাসা, এত মোহমায়া—সকলই সে কিরূপে ভুলিল? আমার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখিলে যে পাগলিনীর ন্যায় হইত, আমার সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিলে যে স্বর্গসুখ অনুভব করিত, সে এখন কোথায়? এমন ভাগ্যও কি আমার হইয়াছিল? আমি কাঙ্গাল হইয়া মণি লাভ করিয়াছিলাম, বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শ করিয়াছিলাম, অসুর হইয়া অমৃত পান করিয়াছিলাম, মানব হইয়া পারিজাত পুষ্পের অধিকারী হইয়াছিলাম, ভেক হইয়া পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীতে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, আমার সকল সুখেরই উদয় হইয়াছিল। যাহা মানুষের হয় না, যাহা কেহ আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত করিতে পারে না, আমার তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন প্রিয়া সহবাসে থাকিতাম, তখন এক একবার মর্ত্ত্যের প্রতি, এক একবার স্বর্গের প্রতি চাহিতাম, ভাবিতাম, কোন্‌টা স্বর্গ? স্বর্গ কি আর স্বতন্ত্র আছে? যদি থাকে, তাহা চাহি না। সহস্র স্বর্গ আমার এই স্বর্গের নিকট নগণ্য, তুচ্ছ। এমন রত্ন পাইয়া, এমন অমৃত জীবন লাভ করিয়া আবার বঞ্চিত হইলাম। হায় বিধাতঃ! এত ভাগ্য আমাকে দিয়াছিলে?

আমার ভাগ্যের পরিণতি কোথায় কেহ বলিতে পারে না। তাই ভাবিতেছি, উন্মত্তের ন্যায় আশা করিতেছি, যদি আবার একবারের নিমিত্ত—নিমেষের তরে—তাহার দর্শন পাই। একবার প্রাণ ভরিয়া তাহাকে দেখিয়া লই—এবং জিজ্ঞাসা করি—কি করিলে কোথায় যাইলে তাহাকে পাওয়া যায়। তুমি অদৃষ্টবাদী, তুমি আমাকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছ। আমিও তোমাকে অদৃষ্টের নাম করিয়া নিবৃত্ত হইতে মিনতি করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, বুঝি তাহাকে নিরন্তর কাতর প্রাণে আরাধনা করিলে, ধ্যান ধারণায় তাহার আসন টলিবে, সে আমার দর্শন দিবে। তাহার দিব্যমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ জুড়াইব, চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাইব, দেহ প্রাণ পবিত্র করিব। আর একবার—একবার—তাহার পদযুগল ধারণ-পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। সে স্বর্গধামে গমন করিয়াছে, সে দেবী, সে অবশ্যই আমার ভাগ্যের কথা জানে, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিবে, কিরূপ সাধনা করিলে, কি কার্য্য করিলে, আবার তাহাকে পাইব। হায়! আজি এই ভাগ্যের কথাতে কত কথাই মনে পড়িতেছে। যে দিবস প্রথম শুভ সম্মিলন হয়, সে দিবস উভয়ে উভয়ের সৌভাগ্যের কত কথাই বলিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, "কত পুঞ্জ-পুঞ্জ পুণ্যফলে তোমাকে পাইলাম। আমার ন্যায় ভাগ্যবান সংসারে আর কেহ নাই।" এখন কিন্তু তাহার বিপরীতই মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, আমার ন্যায় হতভাগ্য জীব সংসারে আর কেহ নাই। যদি তাহাকে হারাইতেই হইবে, অকালে সেই কমনীয় পুষ্পকে ভগবান বৃন্তচ্যুতই করিবেন, তবে তাহাকে দিলেন কেন? তাহাকে না পাইলে আমার জীবনত শ্মশান হইত না। চিতাগ্নিতে তাহার দেহ ভস্মীভূত

হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই বহ্নি আমার হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। এ হুতাশন কবে নির্ব্বাপিত হইবে, কবে আমার চিতাগ্নির সহিত এ হৃদয়াগ্নি মিশিবে, জানি না। ভাগ্যে কি আছে বলিতে পারি না। আমার ন্যায় হতভাগ্য জীব কখন জন্মগ্রহণ করে নাই, যেন কখন করেও না।

যে ভাগ্যকে একদিবস ধন্য ভাবিয়াছিলাম, অদ্য সেই ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছি। এক দিবস এক গিরি-উপত্যকায়, নয়ন-মনোহারী উপবন মধ্যস্থিত সরসীতটে উভয়ে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম। উভয়ে উভয়ের বাহুপাশে বদ্ধ, উভয়েরই চিত্ত প্রেম-বিগলিত। সেই দিন— যখন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে, কোমল কটাক্ষে, মধুর স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "স্বামিন্! এ জগতে আমাদের অপেক্ষা সুখী কে?" তখন মনে হইয়াছিল, আমি পরম সৌভাগ্যবান, আমার ন্যায় কেহ সুখী নাই। সেই একদিন, আর আজি একদিন। এখন তাহাকে হারাইয়া প্রাণের বেদনায় অস্থির হইয়াছি, এখন তাহার দর্শনলাভাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি, তথাপি তিলেকের নিমিত্ত সে আসিতেছে না। এমন মন্দ-ভাগ্য কাহারও আছে কি?

সৌভাগ্যের কত কথাই মনে পড়ে। সে সকলের যতই আলোচনা করি, মনোমধ্যে সে সকল কথার যতই উদয় হয়, ততই নিজের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য অনুভূত হইতে থাকে। কি ছিলাম, কি হইয়াছি। কি হইব, তাহা ভাগ্যই জানেন। এমন যেন অতি-বড় শত্রুরও না হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নলরাজ পত্নী-বিয়োগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের আবার পুনর্ম্মিলন হইয়াছিল, পুনঃ পত্নী লাভের আশা হৃদয়ে বলবতী ছিল। তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, তাঁহারা দেবতা, তাঁহারা পুণ্যশ্লোক।

তাঁহাদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কেন? আমি যে মহাপাপী, নরকের কীট; পূতিগন্ধময়, রোগ-শোক-সমাকুল সংসারে ভগ্ন-হৃদয়ে বাস,—আমার ভাগ্য-লিপি। সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সে বিরহ যন্ত্রণা অধিক দিবস ভোগ করেন নাই, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার ভাগ্যে তাহা হইল কৈ? আমি পাতি পাতি করিয়া পৃথিবী অন্বেষণ করিতেছি, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে সুজলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রী, যে দিকে চাহিতেছি—কোন দিকেইত কেহ ইঙ্গিতেও আমাকে আহ্বান করিতেছে না। কেহত সেই অজানাদেশের পথ দেখাইয়া দিতেছে না। যখন সান্ধ্যগগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, একে একে কত লক্ষ লক্ষ তারা নিরীক্ষণ করি, তখন কত আশারই সঞ্চার হয়। মনে হয়, আমার প্রাণসমা প্রেয়সী বোধ হয় ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র-লোকে বিচরণ করিতেছে; মনে হয়, আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, আমার প্রেমের গভীরতা জানিবার জন্য হৃদয়েশ্বরী গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে লুকোচুরি করিতেছে, অলক্ষ্যে থাকিয়া আমার সকল কার্য্য—আমার মনোভাব অবলোকন করিতেছে। আমার কাতরতা, ব্যাকুলতা, একাগ্রতা, তন্ময়ত্ব দর্শন করিয়া প্রিয়া এখনই অঙ্গুলি হেলনে আমাকে আহ্বান করিবে। কিন্তু কৈ তাহাত হয় না। কত দিন কাটিয়া গেল, গগণ-প্রান্তে চক্ষু রাখিয়া কত নিশা অবসান করিলাম, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার দর্শন ভিক্ষা করিলাম, কৈ সে আমাকেত দেখা দিল না! সে যদি আমার অবস্থা জানিতে পারিত, নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিত। সেত নির্ম্মম নহে। তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের প্রস্রবণ, প্রীতির নির্ঝরিণী, সারল্যের উৎস, মমতার বারিধারা বিরাজ

করিত। যে আমার সামান্য ক্লেশে অধীর হইয়া পড়িত, আজি সে আমার সহস্র যন্ত্রণায় দেখা দিতেছে না, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

মনে করিলাম বুঝি, অরণ্যপ্রান্তে, সাগর বেলায় দিকবালাসহ সে ক্রীড়া করিতেছে; আমার অস্ফুট ক্ষীণস্বর তাই তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে না। অমনি উর্দ্ধশ্বাসে চীৎকার করিতে করিতে সাগরাভিমুখে ধাবমান হইলাম; পথের ক্লান্তি, ক্লেশ কিছুই অনুভূত হইল না। কতদিন দৌড়াইয়াছি, পথে কি করিয়াছি, কিছুই মনে নাই। উন্মাদ জ্ঞানে কেহ তিরস্কার, কেহ পুরস্কার করিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক, অবশেষে সাগর সৈকতে উপস্থিত হইলাম। অতি বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ সাগরের অন্ত কোথায়? সম্মুখে অসীম, অনন্ত জলরাশি—উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বারিধি—পশ্চাতে বহু বিস্তৃত নির্জ্জন নিবিড় অরণ্যানী। সেথায় মনুষ্যের কোলাহল নাই, জীব জন্তুর সমাগম নাই—কেবল সাগরের হু হু শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে। সমুদ্র-তটে বালুকারাশির উপর দণ্ডায়মান হইয়া মনে হইল, আমাকে দেখিয়া সাগরবালাগণ বুঝি বিদ্রূপ করিতেছে। নতুবা আমার হৃদয়ের তার যে সুরে বাঁধা, যে গীত প্রাণের ভিতর নিশিদিন শ্রুত হইতেছে, সেই "হু হু" রব সাগর হইতে উত্থিত হইবে কেন? ওরে, কেরে আমাকে অধীর করিয়া হু হু রবে আমার প্রাণের গীত গাহিতেছিস? একবার দেখা দে—একবার প্রাণ ভরিয়া ঐ মধুর সঙ্গীতে বলিয়া দে—সে আমার কোথায়? আমি তাহার জন্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সুখদুঃখ ত্যাগ করিয়াছি, সংসারের মায়া-মমতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি—আমি অনন্ত মনে তাহারই ধ্যান

ধারণায় রত হইয়াছি। বলিয়া দাও সে আমার কোথায়? বলিয়া দাও, কি করিলে, কোথায় যাইলে তাহাকে পাইব? আমি নারকী হইতে পারি—সে পুণ্যবতী হইতে পারে, কিন্তু তাহার ছায়া লাভে আমার পাপ তাপ শীতল হইয়া যাইবে—আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল! আমি তাহার জন্য এত কাতর—তাহার দর্শন লাভাশায় এত ব্যগ্র, তথাপি তাহার দর্শন পাইতেছি না। যদি সংসারে সমবেদনা থাকে, যদি দেববালার হৃদয় পুণ্য-পবিত্রতাপূর্ণ হয়, তবে এই হতভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার হৃদয়ের হৃদয় যেখানে, সেখানে লইয়া চল। হায়! হায়! সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া এতই চীৎকার করিলাম, সেই বালুরাশির মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া কাতর প্রাণে এতই কাঁদিলাম, কিন্তু বনদেবী বা সাগরবালা কাহারও ত দয়ার উদ্রেক হইল না। পশ্চাতে প্রতিধ্বনি বিদ্রূপ করিল—সম্মুখে সাগর-গর্ভ হইতে সেই হু হু শব্দই উত্থিত হইতে লাগিল। আমার দশা দেখিয়া সেই অজানা-দেশের কথা কেহই বলিয়া দিল না।

মনে হইল, জলধি-বক্ষে ঝম্প প্রদান করি। এই যে সম্মুখে অনন্ত অসীম সলিলরাশি—ভব সাগরও কি এইরূপ। মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, আমার ন্যায় কূলে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহার পর সাগর-বক্ষে পতিত হইলে কোথায় চলিয়া যায়, কিছুই স্থিরতা থাকে না। আমিও যদি পতিত হই, কোথায় চলিয়া যাইব, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কখন ডুবিব, কখন উঠিব, কখন ভাসিব। কাল সাগরে জীবের এমনই দশা ঘটে। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল, সেত আমার এ সাগরে পড়ে নাই। আমি এখানে পড়িলে তাহাকে পাইব কিরূপে? এ সাগরের দিক্‌নিচয় ও স্থানাদি মনুষ্যের জ্ঞানাধীন—কিন্তু সে সাগরের

কোন সংবাদই কেহ জানে না; এখানে তরণী লইয়া নাবিকগণ নানাস্থানে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সে ভব-সমুদ্রের কাণ্ডারী নাবিককে কেহ যে চিনিতে পারে নাই— কেহ যে জানে না। এ সাগরে সে সাগরে প্রভেদ বিস্তর। সুতরাং এ সাগরে মগ্ন হইয়া লাভ কি? আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট,—তাই সাগর-বক্ষে ঝাঁপ দিতে পারিলাম না— কেবল হু হু রবে প্রাণের কথা হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ করিয়া মহাসাগর আমাকে পরিহাস করিল।

এক একবার মনে হয়, সংসারের এত টিট্‌কারী ধিক্কার, এত বিদ্রূপ পরিহাস সহ্য করিব না। তাহাকে আর ডাকিব না, আমি নিজের সুখের কামনায় তাহাকে ডাকিতেছি—ইহাতে যদি তাহার স্বর্গবাসের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে, কোনরূপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার পাপের সীমা থাকিবে না। তাহার পরকালের ইষ্ট সাধনই আমার কর্ত্তব্য। তাহাকে ডাকিব না। তাহার আত্মার কল্যাণ কামনায় ভগবানের আরাধনা করিব।

মনে করি, তাহাকে ভুলি, কিন্তু ভুলিতে পারি কৈ? মরমে মরমে যে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহা যে কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না। ভুলিবার নিমিত্ত কত কৌশল—কত উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিলাম মনকে কত দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না—ভুলিতে পারিলাম না। যত ভুলিবার চেষ্টা করি, ততই প্রবলতর বেগে তাহার স্মৃতি আমার হৃদয়-দ্বারে যেন আঘাত করিতে থাকে। তাহার প্রসঙ্গ, তাহার কথাই মধুর মনে হয়। অন্য কথার আলোচনা, অন্য বিষয়ের অবতারণা করিলে তাহা বিষবৎ বোধ হইতে থাকে। তাহাতেই তাহাকে ভুলিতে পারি না। বিস্মৃতি অপেক্ষা স্মৃতি

যেন অধিকতর প্রীতিকর—প্রাণারাম। এই জন্যই তাহার অবস্থান-বার্ত্তা জানিতে উৎসুক। এই নিমিত্তই কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেছি, তোমরা বলিয়া দাও—সে আমার কোথায়? যদি আমার চিন্তায় তাহার স্বর্গসুখের কিঞ্চিন্মাত্র হানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা তাহার অধিকতর শত্রু আর কেহ নাই। আমার স্থান নরকেও নাই। হে প্রভো! আমার অপরাধের নিমিত্ত বালিকার প্রতি দণ্ড বিধান করিও না। স্বর্গের দেবী স্বর্গচ্যুতা যাহাতে না হয়, তাহারই বিধান করিও। তাহাকে স্মরণ করিতেছি বলিয়া জন্ম জন্ম আমার নরকে বাস হউক, কিন্তু তাহার যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে। তবে এই মাত্র বলিতে চাহি—আমার ভাগ্যে যাহাই থাকুক,—সে আমার সুখে থাকুক—ইহা ব্যতীত আমার মনে অন্য কোন সাধ বা বাসনা নাই। তাহার সুখ সম্পাদনই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রই জপ করিতে করিতে মানব-লীলা সংবরণ করিতে পারি,—ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা।

ভালবাসা।

এখন অনেকেই আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিয়া থাকেন, "সে আমাকে ভালবাসিত না। ভালবাসিলে সে কি কখন আমাকে ছাড়িয়া যাইতে অথবা ছাড়িয়া থাকিতে পারিত? সে আমার শত্রু ছিল। তাই দুই দিনের জন্য মিলিত হইয়া, প্রণয়-ফাঁদে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার নিমিত্ত হা হুতাশ করিয়া মরিতেছি। ভালবাসার ইহাই কি পরিচয়?"

এমন কথা যাঁহারা বলেন, আমি তাঁহাদিগকে মিত্র মনে করি না। তাহার ভালবাসায় খুঁত ছিল না—সে প্রেম, বর্ষার কুলপ্লাবী ভরা গঙ্গার ন্যায় পূর্ণ—সে প্রেম ধীর স্থির—তাহাতে তরঙ্গের লীলা ছিল না—তাহাতে আবর্ত্তের ভীষণতা দৃষ্ট হইত না। সে পবিত্র, পূর্ণ প্রেম। তাহার ভালবাসায় তোমরা কেহ দোষ দিও না।

ভালবাসা কাহাকে বলে, তোমরা কি তাহা জান? দুই দিনের জন্য একটী পাখী পুষিলে, পাখী পড়িতে শিখিল, তোমার মনোমত কত বুলিই বলিতে লাগিল। তাহার পর এক দিন পাখী পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল, তুমি সেই পাখীর নিমিত্ত কাতর হইলে—বলিতে লাগিলে, পাখী তোমার প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে। দুই দিনের নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে—তাহার পর সর্ব্বংসহা কালের প্রভাবে সকলই ভুলিয়া গেলে। ইহা যদি ভালবাসা হয়—তাহা হইলে তুমি ভালবাসিতে জান না, ইহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিব।

তোমরা যাহাকে প্রেম বল, আমি তাহাকে মোহ বলি। প্রেমে ও মোহে বিস্তর প্রভেদ। স্থূলস্থানে উহা নামান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে—প্রেমের একটু রসাস্বাদন করিতে পারিলে—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য অনুভূত হইবে। এই সংসার মায়াময়। মায়ামোহে সকলে বদ্ধ। স্ত্রী বল পুত্র বল, ভ্রাতা বল. ভগিনী বল, পতি বল, পত্নী বল, জনক বল, জননী বল, সকলেই মায়াঘোরে অচৈতন্য—সকলেই মোহের বন্ধনে আবদ্ধ। এই মোহ হৃদয়কে যতদিন পূর্ণ করিয়া রাখে, ততদিন ইহা প্রেম বলিয়া প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা প্রেম নহে। যেখানে দেখিবে তোমার ভালবাসা বা মোহ ক্ষণস্থায়ী, কালসাপেক্ষ, সেখানে তাহাকে প্রেম আখ্যা প্রদান করিও না। প্রেম পবিত্র পদার্থ। প্রেম স্বর্গীয় বস্তু, দুর্লভ বস্তু।

যাহা রূপজ বা গুণজ, তাহা মোহ বা মায়া নামে অভিহিত। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, কমনীয় কান্তি আছে—তোমাকে দেখিলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয়, বিলাসিতার তরঙ্গ উঠে, সুতরাং তোমাকে ভালবাসি, ইহাই রূপজ মোহ। এই মোহের সম্বন্ধ—রূপের সহিত। যতদিন তোমার রূপ থাকিবে অথবা তোমা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বা সুন্দরীকে না দেখিব, ততদিন তোমার রূপে মুগ্ধ থাকিব, ইহাকে ভালবাসা বলে না। এরূপ ভালবাসা, এরূপ প্রেম সংসারে বিরল নহে। রূপ ক্ষয়ে, বয়োবৃদ্ধিতে এই মোহের যেমন হ্রাস হয়, সহবাস-জনিত মায়ায় হৃদয় তদ্রূপ অধিকৃত হইতে পারে বটে; সুতরাং কখন কখন যৌবনে রূপজ মোহে আবদ্ধ জীব বার্দ্ধক্যেও পরস্পর একত্র হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব, গভীরতা নিতান্ত অল্প।

গুণজ মোহও ঐরূপ। তোমার রূপ নাই, ঐশ্বর্য্য আছে অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণ আছে, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইলাম। যত দিবস তোমার সেই গুণ বলবৎ থাকিবে—যত দিবস তোমার সেই গুন আমার প্রাণে বীণার ঝঙ্কার দিতে থাকিবে, তত দিবস আমি তোমার অধীন। কিন্তু একবার কোন সূত্রে মোহ অন্তর্হিত হইলে তোমাতে আমাতে আর সম্বন্ধ থাকিবে না। রূপজ বা গুণজ মোহ পার্থিব—প্রেম অপার্থিব, স্বর্গীয়।

কবি কল্পনায় আমরা এই রূপজ ও গুণজ মোহের চিত্রই অধিকতর প্রতিফলিত দেখিতে পাই। তোমার সাবিত্রী দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা, তোমার শকুন্তলা তিলোত্তমা, তোমার ডেসডেমোনা, ক্লিওপেট্রা, তোমার রেবেকা আয়েষা সর্ব্বত্রেই এই রূপজ বা গুণজ মোহের পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হইবে। প্রথমে কেহ হয়ত, নয়নাভিরাম সুন্দর বপু—কেহ বা অনুপম গুণ সন্দর্শন করিয়া মোহিত হইয়াছেন। তাহার পর মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। সত্য বটে, অনেকে ইহাতে অবশেষে আত্মহারা পর্য্যন্ত হইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে স্বার্থের সংস্রব থাকায় উহা কলুষিত হইয়াছে।

যাহা রূপ দেখে না, গুণ দেখে না—যাহা আত্মজ—তাহাই পবিত্র প্রেম। এই প্রেম-সলিলে অবগাহন করিলে জন্ম হয় না—কলুষ কলঙ্ক দূরীভূত হয়—মানুষ দেবতা হয়। প্রেমের এই পূর্ণ বিকাশ [illegible] হর-গৌরীতে দেদীপ্যমান। শ্মশানচারী, চিরযোগী, ভিখারী ভাঙ্গড় ভোলাকে না দেখিয়া, তাঁহার গুণের কথা না শুনিয়া গৌরী এক-মনে একধ্যানে তাঁহারই উপাসনা করিয়াছিলেন। রূপতৃষ্ণায় গৌরী ব্যাকুলা হন নাই, গুণ গরিমায় গৌরী মুগ্ধা হন নাই। বালিকা গৌরী

শিবপূজা করিতেন—শিবেতেই তাঁহার মনঃপ্রাণ অর্পিত ছিল। শিব কে, কোথায় থাকেন, কেমন রূপবান, কিরূপ গুণবান্, কিছুরই তিনি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হন নাই। তিনি মহেশের নামেই মুগ্ধ। আত্মা হইতে তাঁহার প্রেম-প্রবাহ ছুটিয়াছিল। মর্ম্মে মর্ম্মে, প্রাণে প্রাণে তিনি শিবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আধ হর আধ গৌরী, আধ-পুরুষ আধ-প্রকৃতি, আধ জটাজূটধারী ভস্মলেপিত কলেবর, আধ-চিকুরজালসমন্বিতা মণিমুক্তালঙ্কার-ভূষিতা কনককান্তি মহেশ্বরী। ওহো! এমন রূপ—এমন লীলা কেহ কখন দেখিয়াছ কি? কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ, প্রেমের পূর্ণাহুতি যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই হর-গৌরী সম্মিলনে হইয়াছে।

আমি জানি ইহাই প্রেম। সে আমাকে এই প্রেমেই বাঁধিয়াছিল। ওগো! তোমরা তাহার প্রেমের মর্য্যাদা-হানি করিও না। আমার মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত হউক, আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হউক, তথাপি আমি তাহার প্রেমের নিন্দা শুনিতে পারিব না। সে আমার প্রেমময়ী, পুণ্যবতী। কলঙ্কের কিঞ্চিন্মাত্র কৃষ্ণচ্ছায়াও তাহাতে পতিত হয় নাই। সে সমস্ত প্রাণটা দিয়াই আমাকে ভালবাসিত। স্বার্থের প্রতি তাহার কখন দৃষ্টি ছিল না—সে আমাকে আত্ম-সমর্পন করিয়াছিল। এমন-আমার সে কোথায় গেল? নিষ্ঠুর কাল যদি বলপূর্ব্বক তাহাকে আমার ক্রোড় হইতে লইয়া না যাইত—অনিচ্ছা সত্বেও সে যাইতে বাধ্য না হইত—তাহা হইলে সে কখনই আমায় ত্যাগ করিত না। আমি হেয়, ঘৃণ্য জীব। আমার তাপে সে কনকলতিকা বিশুষ্ক হইয়া গেল। দোষ তাহার কিছুমাত্র নাই, সকল দোষই আমার। যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে তুলিকা বিন্যাসে তাহার

অমৃতময় অপরূপ প্রেমচ্ছটা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতাম। আমি তাহার প্রেমামৃত পান করিয়া অমর হইয়াছি। অমর না হইলে আমার এততেও মৃত্যু হয় না!

আমি ভালবাসিতে জানি না বলিয়া কি সে অভিমান করিয়া আমাকে ত্যাগ করিল? তাহাও ত হইতে পারে না। তাহার ভালবাসা—যে প্রকৃত প্রেম-পর্য্যায়ভুক্ত! সে ভালবাসা ত প্রতিদান চাহে নাই। আমি ভালবাসি আর না বাসি, সে তাহা ত দেখিত না; সে আমাকে ভালবাসিয়াই সুখী ছিল। আমার পায়ে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে সে দন্তদ্বারা তাহা উৎপাটন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। সে মুখ-চাওয়া ভালবাসার ধার কখন ধারে নাই। তবে আমার অকৃতিত্বে, আমার অধমত্বে তাহার অভিমান বা রোষ হইবে কেন? কেন সে আমাকে ত্যাগ করিল?

তোমরা কেহ একবার তাহাকে আমার চক্ষের সম্মুখে আনিতে পার কি? আমি একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন অপরাধে সে আমাকে এই গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করিল? আমি তাহার অযোগ্য, তাহা জানি। কিন্তু তাহা জানিয়াও তাহার দর্শন লাভে বঞ্চিত হইব, একথা ধারণা করিতে পারি না। আমি স্বার্থের দাস, আমি তাহাকে দেখিতে চাহি। আমার সংস্পর্শে—আমার দৃষ্টিতে সে কলঙ্কিত হইতে পারে। কিন্তু আমি ত তাহা বুঝি না। আমি তাহাকে দেখিলেই সুখী—সুতরাং দেখিবার নিমিত্ত পাগল। আমার এই উন্মত্ততা কিছুতেই প্রশমিত হইবে না। সে ত তাহা জানে, তবে দয়াবতী একবার দয়া করিয়া দেখা দিবে না কি?

বুঝিয়াছি, মানুষের যখন কপাল ভাঙ্গে, তখন এমনই হয়। আত্মীয়

স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলই 'পর' হয়। যাহাকে কুসুমদাম মনে করিয়া গলদেশে ধারণ করিলাম, সেই কালফণি হইয়া হৃদয়ে দংশন করিল! হউক, আমার ইহাতে ক্ষতি নাই। যে মরা, তাহাকে মারিয়া লাভ কি? এজীবন যাইলেই ত মঙ্গল। এজীবনে প্রয়োজন কি? যখন তাহাকেই হারাইয়াছি, তখন বিরহের শত বৃশ্চিকদংশন হইতে যত শীঘ্র অব্যাহতি লাভ করিতে পারি, ততই মঙ্গল। কিন্তু পাপ জীবন যে কিছুতে যায় না!

ছি! ছি! আমি মৃত্যু-কামনা করিতেছি। মরিলে ত সবই ফুরাইয়া গেল। কাল সাগরে ভাসিতে ভাসিতে দুই জনে মিলিত হইয়াছিলাম, আবার কালের তরঙ্গাঘাতে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। আর কখন মিলিত হইব কি না জানি না। জানেন অন্তর্য্যামী ভগবান। তবে যে কয় দিবস তাহার মধুর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, সে কয় দিবস সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা বা বাঞ্ছা করি কেন? মরিলে ত তাহাকে আর পাইব না—অধিকন্তু তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলীন হইবে। এই যে স্মৃতির দহনে দগ্ধ হইতেছি—ইহাতেও সুখ আছে। গরলে অমৃত যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে ইহাতেই আছে। আমি অহর্নিশ তাহাকে ভাবিতে পাইতেছি, তাহারই প্রসাদে দিন-যাপন করিতে পারিতেছি, ইহা অপেক্ষা আর সুখ কিসে হইতে পারে? জানি না মরিয়া কি হইব। এই নিশ্চয়তা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চয়-তার ঘনান্ধকারে নিমগ্ন হইতে চাহি না।

আমি যে তাহাকে ভালবাসি বা ভালবাসিতাম, তাহা বলিতে চাহি না। যদি ভালবাসিতেই পারিতাম, তাহা হইলে মহাদেবের সতী-দেহ স্কন্ধে ধারণের ন্যায় তাহাকে স্কন্ধে লইয়া সংসার পরিভ্রমণ

করিতাম। তাহাকে কখন ছাড়িতে পারিতাম না। সে মৃত, আমি জীবিত, এই জ্ঞান আমার থাকিত না, থাকিতে পারিত না। সেই শবদেহ—সেই লক্ষ্মীর পূর্ণমূর্ত্তি আমার অঙ্গে মিশিয়া থাকিত, বিষ্ণুচক্র ব্যতীত কেহ তাহা ছেদন করিতে পারিত না।. কিন্তু তাহাও করিতে পারি নাই। লোকে যাহা করে, আমিও তাহাই করিয়াছি। শবদেহ চিতাশয্যায় শায়িত করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছি। হুতাশন আমাকে যেন টিট্‌কারী দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। সেই প্রজ্বলিত চিতানলে প্রাণপ্রিয়া ভস্মীভূত হইল। আমার প্রাণাধিকাকে অগ্নিদেব গ্রহণ করিলেন। আমি মুখে "হরিবোল" "হরিবোল" ব্যতীত আর কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলাম না।

ইহাই কি প্রণয়ের পরিচয়? ইহাই কি প্রীতির প্রতিদান? ইহাই কি মনুষ্যত্ব! ইহাই কি প্রেমপিপাসা? আমি যাহাকে রাখিতে পারিলাম না, আমি যাহাকে অঙ্কচ্যুত করিলাম, ব্রহ্মা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ভাই! প্রেমে মানুষকে বিকার-শূন্য করে। আমি পূর্ণ বিকারগ্রস্ত, আমি প্রেমের মর্য্যাদা কি বুঝিব? আমার মুখে ভালবাসার কথা যেন কেমন কেমন শুনায়। সে আমাকে—সমগ্র জগৎকে—ভালবাসা শিখাইতে আসিয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী যোগ্য পাত্র পাইল না, তাই বোধ হয় অভিমানে চলিয়া গেল। আমি মূঢ়, নির্ব্বোধ। প্রেমের উচ্চ শিক্ষা কিরূপে লাভ করিব? তাই প্রেম-প্রতিম প্রিয়া আমাকে বোধ হয় ত্যাগ করিয়াছে!

তোমরা কি কেহ বলিতে পার, তোমরা কি কেহ শিখাইতে পার, প্রেম-অধ্যায়ের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা কিরূপ? যদি জান, দয়া করিয়া অভাগাকে শিখাইয়া দাও। আবার যদি প্রাণপ্রিয়ার কখন দর্শন পাই,

পায়ে ধরিয়া বলিব, প্রেম-শিক্ষা আমার পূর্ণ হইয়াছে। হৃদয়মন্দিরে প্রিয়ার অধিষ্ঠিত মূর্ত্তিকে প্রাণ ভরিয়া প্রীতি-প্রেমের কুসুমাঞ্জলী দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব; নয়নাসারে তাহার পদধৌত-পূর্ব্বক প্রেমের পরিচয় দিব। আশা—যদি তাহাতে তাহার সন্তোষ বিধান করিতে পারি, যদি তাহাতে তাহাকে চিরকালের নিমিত্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারি।

আমি তাহাকে ভালবাসি কি না, জানি না। তবে এই মাত্র জানি, আমার স্বত্বা তাহাতেই বিন্যস্ত হইয়াছে। আমার বর্ত্তমান মূর্ত্তি জীয়ন্তে-প্রেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাতে আমাতে কখনও প্রভেদ ছিল না, থাকিতে পারে না। দুইয়ে এক—একে দুই। সে ইহা জানিত, অনুভব করিত। আমার হরিষে বিষাদে তাহার তাহার হর্ষ বিষাদ হইত। তাহার সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ হইত। সে গিয়াছে, আমার প্রাণের সৌন্দর্য্য—আমার আমিত্বের-যাহা কিছু, সকলই তাহার সহিত গিয়াছে। ছায়ায় কায়ায় যেরূপ নিত্যসম্বন্ধ, তাহার এবং আমার প্রাণেও তদ্রূপ সম্বন্ধ। জীবনের যাহা কিছু বল-শক্তি, সকলই সেই ছিল। তাহার তিরোধানে আমার আমিত্বেরও তিরোধান ঘটিয়াছে।

সে ছিল, তাই আমি ছিলাম, তাই আমার স্বত্বা অনুভূত হইত। প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষ কি? শক্তিহীন শিব শুদ্ধই শবরূপী। সেই আমার জীবনের সৌন্দর্য্য—বলাধান। মহিলা না থাকিলে এ সংসার কি হইত, বলিতে পার কি? যাহা কিছু লোক-লোচনে পতিত হইতেছে, যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্রও গঠিত বা সৃষ্ট হইত না। মহিলা সংসারের সার। শচী বিহনে ত্রিদিব, গৌরী বিহনে কৈলাস, লক্ষ্মী বিহনে বৈকুণ্ঠ যাহা হয়, স্ত্রীবিহনে সংসারও তাহাই। সংসারের

যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু শান্তিময়, যাহা কিছু প্রেমময়, যাহা কিছু প্রীতি-স্নেহ-মমতাপূর্ণ, তাহাই মহিলা-জনিত, মহিলা-সৃষ্ট। মহিলা না থাকিলে তুমি আমি কোথায় থাকিতাম? কিরূপে জগতে আসিতাম? কামিনী আছে বলিয়াই তুমি সংসারী, তোমার হস্তপদ সঞ্চালিত হইতেছে, তুমি পৃথিবীর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছ। ভামিনী তোমার জীবন। নারী প্রকৃতি, নর পুরুষ। প্রকৃতি বিহনে পুরুষ জড়, অচেতন। স্ত্রীলোক না থাকিলে জগতের সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, অচেতন জড়ের ন্যায় তোমাকে আমাকে পড়িয়া থাকিতে হয়। তুমি এই যে এতটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, জ্ঞানশিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন করিতেছ, যাহা কিছুতে তোমার অস্তিত্ব অনুভূত করাইতেছ, ইহা কাহার জন্য বলিতে পার কি? রমণীর মহিমা একমুখে কীর্ত্তন করা যায় না।

সে আমার রমণীকুলের শিরোরত্ন ছিল। তাহার চাল চলনে, আচার ব্যবহারে অমিয় ঝরিয়া পড়িত। তাহাকে হারাইয়াছি, সুতরাং আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইবে আশ্চর্য্য কি! সে রত্ন হস্তে পাইয়া যে বঞ্চিত হয়, তাহার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? তাহার মৃত্যুই মঙ্গল। আমি তাই মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। যদি মরি, তাহাতেও দুঃখ করিবার কারণ থাকিবে না। মরণান্তে সে যদি আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমি নবজীবন লাভ করিব—অমরত্ব পাইব।

পাগল।

লোকে আমাকে পাগল বলে। আমার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। আমি জানি না ইহা সত্য কি মিথ্যা। কিন্তু মনে হয়, কথাটা মিথ্যা। মহেশ্বর পাগল। যদি কখন শিব হইতে পারি, তবে পাগল হইব। আহা, উন্মত্ততায় কি সুখ! সংসারের সুখ দুঃখ, রোগ শোক কিছুতেই পাগল অভিভূত হয় না। উন্মত্ততা সারল্যের আধার, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। উন্মত্ততায় যে মাদকতা আছে, বিশ্বসংসারে আর কিছুতেই তাহা নাই। উন্মাদের প্রলাপ, গভীর দার্শনিক সত্যের ধ্বনি। তুমি আমি বুঝিতে পারি না—কিন্তু উন্মাদ হইলে, ঠিক তেমনই পাগল হইলে, তাহার বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইতে পারা যায়।

আমি যদি উন্মত্ত হইতাম, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতাম। এই যে তাহার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছি, এই যে আহারাদি পরিহারপূর্ব্বক তাহাকে নিরন্তর ডাকিতেছি, দিবারাত্রি হা হুতাশ করিতেছি, এই যে তাহার অদর্শনে, শোকে অভিভূত হইতেছি—মত্ততা থাকিলে, তন্ময়ত্ব ঘটিলে এ সকল কি থাকিত? তখন তাহারই চিন্তা করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইত—অন্য চিন্তা মাত্র থাকিত না—সমাধিস্থ হইতাম। তখন তাহাতে আমি লীন হইয়া যাইতাম। আমাতে তাহাতে কি কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত? আমার আমিত্ব অথবা তাহার তাহাত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইত। তখন মহাযোগী ভূতভাবন ভবেশের ন্যায় সোহহং হইতাম। পাগলের ইহাই

লক্ষন, ইহাই প্রমাণ। আমাতে তাহার ত কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই। আমি হাসিতেছি কাঁদিতেছি, আমি বসিতেছি উঠিতেছি, বাহ্যচৈতন্য আমার পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে—তবে আমি পাগল কিসে ভাই? মহাপুণ্যফলে লোকে পাগল হয়। যে সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী—সে যখন সাংসারিক আচার-ব্যবহার-বিরুদ্ধ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করে, তখন তুমি তাহাকে দেখিয়া পাগল মনে করিয়া হাসিয়া থাক; সেও হয়ত তোমাদিগকে অনিত্য সংসারে মুগ্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরকে হয়ত পাগল মনে কর। কিন্তু কেহ কাহারও মর্য্যাদা বুঝিতে পার না। যদি তুমি কখন সংসার-ত্যাগী মহাপুরুষ হইতে পার, অথবা সে মায়া-মোহান্ধ ঘোর সংসারী হইতে পারে, তাহা হইলে পরস্পরের অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব। আমার প্রগলভতা, আমার প্রলাপ, আমার বাতুলতা, কেহ যদি কখন আমার অবস্থায় পতিত হন, (ঈশ্বর করুন কেহ যেন কখন পতিত না হন) তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন।

বাতুল হইলে আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে। আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের আত্ম-বিস্মৃতি যে পরম সুখ, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহার অহং জ্ঞান আছে—সে সুখ দুঃখের ভাগী। যাহার আমিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে—সেই সুখী। তাহার নিজের জন্য চিন্তা নাই—ত্রিতাপে সে দগ্ধ হয় না। সে ইহকাল পরকাল জানে না, সুখ দুঃখ বুঝে না, ঋতু পরিবর্ত্তন মানে না। তাহার একাগ্রতা আদর্শস্থানীয়। আমি যদি সেই পাগল হইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা অধিকতর সুখী আর কে হইত? আমার অন্য চিন্তা থাকিত না; হিম শীত, রৌদ্র গ্রীষ্ম কিছুরই প্রতি লক্ষ্য থাকিত না, আত্ম-পর জ্ঞান থাকিত না—কেবল

অনন্যমনে তাহারই মধুর চিন্তায় কালাতিপাত করিতাম। কিন্তু আমিত তাই পাগল নহি। বিশ্বপতি আমাকে সে উপাদানে গঠিত করেন নাই, ইহাই দুঃখ। আমি মহাপাপী, তাই নরক-যন্ত্রনা ভোগ করিবার জন্য বাতুল হই নাই,—তাহার সঙ্গে যাই নাই।

একদিন গভীর নিশিথে নদীসৈকতে নীরবে দণ্ডায়মান আছি। প্রকৃতি সতী ধীরা স্থিরা—কোথাও মনুষ্য সমাগমের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শুদ্ধ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঝীঝিরব কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে, মধ্যে মধ্যে শৃগাল কুক্কুরের স্বরও শ্রুত হইতেছে। আমি এরূপ সময়ে একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলাম। সাধ হইল, নক্ষত্রাবলী গণনা করি। মনে হইল, ঐ গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত শশধরকে কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই প্রিয়ার সংবাদ পাইব। একে একে নক্ষত্র ও তারানিচয়কে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। এক, দুই, তিন, চারি—ওঃ কত তারা—কত নক্ষত্র! ইহার যে আদি নাই, অন্ত নাই। সকলগুলিকে জিজ্ঞাসা করা হইল না। অবশেষে নিশানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু অশ্রুপতনের ন্যায় শিশির বিন্দু পতিত হওয়া ব্যতীত আমার প্রশ্নের অন্য কোন উত্তর পাইলাম না। বুঝিলাম আমার দুঃখে কাতর হইয়া ঐ তারকাবলী—ঐ মৃগাঙ্ক অশ্রুপাত করিতেছে—কিন্তু উত্তর প্রদানে অক্ষম।

আচ্ছা! ঐ গুলি কি? উহারা কি গ্রহ? উহারা কি এমনই এক একটা জগৎ। ঐখানে কি আমারই মতন মানুষ থাকে? ঐখানে কি শোক-তাপ-জর্জ্জরিত মনুষ্যের ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবেশ করে না? যাহারা মরিয়া যায়—তাহারা কি ঐ সমুজ্জ্বল লোকে স্থান পায়? উহাতে যদি প্রাণীর বাস থাকে, তাহা হইলে যখন এক একটা গ্রহ

বিদ্যুদ্বেগে কক্ষচ্যুত হইয়া পতিত হইতে থাকে—তখন কত প্রাণী বিনষ্ট হয়—কত সৃষ্টিই লয় পায়! এজগতের মহাপ্রলয়ও কি ঐ রূপে সংসাধিত হইবে? যে গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়—তাহা আকর্ষণ-শক্তি-প্রভাবে আবার স্থির হয়—কিংবা একেবারে লয় পায়? এজগতের পরিণাম কি? এই পৃথিবী যদি ঐ অনন্ত গগনের ন্যায় হয়, জীবগণ যদি গ্রহাদির ন্যায় হয়—আর মৃত্যু যদি কক্ষচ্যুতির মত হয়—তাহা হইলে জীব আবার কোন স্থানে আকর্ষণ-প্রভাবে স্থির হয় কি? আমার প্রাণেশ্বরীও ঐরূপ কোন স্থানে আকৃষ্ট হইতে পারে। সে স্থান কোথায়? হে শশাঙ্ক! করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি—বলিয়া দাও সে স্থান কোথায়? তুমি ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছ, তুমি সমস্তই দেখিতে পাইতেছ—বল—একবার বল—যে আমার হৃদয়ের লক্ষ্মী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সে এখন কোথায়? হায়! অভাগাকে সকলেই ঘৃণা করে। সময় যখন মন্দ হয়, তখন এমনই ঘটে। যখন প্রিয়া জীবিতা ছিল—তখন হে চন্দ্র! মধুমাসে পূর্ণিমা রজনীতে একদা উপবনে বিচরণ কালে তোমার দিকে চাহিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, তুমি কলঙ্কী কিন্তু আমার বক্ষে অকলঙ্ক শশী। সেই সময়ে তুমি অতি মধুর বোধ হইয়াছিলে। তখন সুসময় ছিল—কাজেই আমার প্রাণে আনন্দদানে তোমাকে কার্পণ্য প্রকাশ করিতে দেখি নাই। আর আজি প্রিয়া-বিরহে আমি কাতর—আমাকে দেখিয়া, আমার ক্রন্দন শুনিয়া তুমি নীরব রহিলে! আমার হৃদয়ে অমৃত ধারা প্রবাহিত না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া দিলে। বুঝিয়াছি, ইহাতে তোমার দোষ নাই—দোষ কালের।

হতাশ নেত্রে নিম্নদিকে চাহিলাম। দেখিলাম, স্রোতস্বতী কুলু

কুলু রবে প্রেমগাথা গাহিয়া সাগর উদ্দেশে ছুটিয়াছে। যাহার প্রেম-প্রবাহ এরূপ, সে কি আমার প্রণয়িনীর সুসংবাদ দান করিয়া, দগ্ধ প্রাণ শীতল করিবে না? আশায় বুক বাঁধিয়া—কলনাদিনী প্রবাহিনীকে আমার জীবনের আরাধ্য দেবীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। তটিনী-ধ্বনি পূর্ব্ববৎ কর্ণে প্রবেশ করিল, সেই কুলু কুলু রব—সেই সমীরণ-সংস্পৃষ্ট-বীচি-বিক্ষোভিত নদীর কুলু কুলু ধ্বনি! সে অব্যক্ত অবোধ্য ভাষায় কি বলিল, বুঝিলাম না। বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িলাম। চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না। কিন্তু যখন চৈতন্যোদয় হইল—তখনও কুমুদিনীনাথ আকাশে বিরাজ করিতেছে—তখনও সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত নদী-বক্ষে মধুর কলধ্বনি সমভাবে উঠিতেছে—তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা তট দেশে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—তখনও প্রকৃতির গম্ভীর ভাব বিদ্যমান। এমন সময়ে—দূরে—অতিদূরে—মধুর কণ্ঠে কে গাহিল—

"ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখী"

দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় কে এমন স্বর-লহরী ছড়াইয়া দিল রে?—আমার প্রাণের পরতে পরতে—মরমে মরমে—সেই স্বর প্রবেশ করিল! আমার মর্ম্ম ব্যথা, প্রাণের কথা জানিয়া বুঝি কোন সম-দুঃখী ঐ গীত গাহিল? আমার পাখীও যে উড়িয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে—কে ধরিয়া রাখিয়াছে জানি না। জানি না বলিয়াই আজি পাগলের মতন আমি চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি—তথাপি কোথাও পাইতেছি না। অমূল্য রত্ন হারাইলে আর কি পাওয়া যায়? যে পায়, সে কি দেয়? আমার পাখী—আহা! তেমন অনুপম সুন্দর পাখী—কে ধরিলি, ছাড়িয়া দেরে! আমি তাহার জন্য জীবন পণ করিয়াছি, তথাপি কে এমন নির্দ্দয় আছিস্, তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিস্?

তাহার পর আবার গাহিল—

"বল্ কে তোরা রাখ্লি ধরে অবলারে দিসনে ফাঁকি।"

মনে করিলাম, আমি অবলা নহি দেখিয়া বোধ হয় কেহ ফাঁকি দিতেছে। আমাকে দেখিয়া দুঃখের দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। তুমি যে হও—আমার পাখী ছাড়িয়া দাও—আমাকে ফাঁকি দিও না। আমি তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি—আমি সত্য বলিতেছি—আমি অবলার অপেক্ষাও দুর্ব্বল। আমাকে ফাঁকি দিলে পুরুষত্ব প্রকাশ পাইবে না। এখন বল, তোমরা কে ধরিয়া রাখিয়াছ? আমার প্রাণের বিনিময়ে যদি পাখী পাই, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। প্রিয়ার সম্মুখে হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, এমন সুদিন আমার কি হইবে?

মধুর কণ্ঠে গায়ক গাহিল—

"বাঁধা ছিল প্রেম শিকলে
কে তোরা নিলি গো ছলে."

একি! এ যে আমারই কথা। তবে কি আমার ন্যায় আর কেহ ব্যথিত হৃদয়ে পর্য্যটন করিতেছে? আমার পাখীও যে প্রেমশিকলে বাঁধা ছিল! আমার পাখীকেও ত ছলনা করিয়া কেহ লইয়া গিয়াছে? নহিলে সে ত যাইবার নহে। সে ত আমা বই আর জানে না। সেত বলে নাই, স্বপ্নেও ভাবে নাই, অন্যের হইবে। তবে তাহাকে, আমার হৃদয় শূন্য করিয়া, ছলনা ব্যতীত অন্যে কিরূপে লইতে পারে? সেই বিশ্ববিমোহিনী ললনার প্রতি কে না আকৃষ্ট হয়। সে গুণবতী, প্রেমময়ী; কাহার হৃদয় না আকর্ষণ করিতে পারে? কে কি ছলনা করিল, জানি না। কোন্ ছলনায় সে ভুলিল জানি

না। তবে আমাকে কাঁদাইয়াছে—আমার হৃদয় শূন্য করিয়াছে—ইহা স্থির। তুমি যেই হও, দেবতা বা মানব হও, আমার প্রাণের পাখীকে ছাড়িয়া দাও। আমি প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছি, তুমি ছলনা করিয়া লইবার কে? তুমি দস্যুর ন্যায়, তস্করের ন্যায় পরস্ত্রী অপহরণ করিয়াছ। ছাড়িয়া দাও—ছাড়িয়া দাও!

তদবধি "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও" রবে আমি দিগন্ত মথিত করিয়াছি। সেই সঙ্গীত আর শুনিবার আমার শক্তি ছিল না। আমি জ্ঞানহারা হইয়া, শুদ্ধ "ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও" বলিয়া কত কাল অতিবাহিত করিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু তদবধি লোকে আমাকে পাগল বলে।

এই "ছাড়িয়া দাও" কথার অর্থ লোকে যদি বুঝিত—এই মর্ম্ম-স্পর্শী শব্দদ্বয়ের রস গ্রহণে লোকে যদি সমর্থ হইত, তাহা হইলে আমাকে কেহ পাগল বলিত না। আমাকে পাগল বলে বলুক, আমার অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করে করুক—কিন্তু আমার পাখী ত কেহই ছাড়িয়া দিল না। আমি বৃথা চীৎকার করিলাম, বৃথা আয়াস করিলাম, আমার পাখী আমার নিকট আসিল না, কাহার শূন্যহৃদয় সে পূর্ণ করিল বলিতে পারি না।

ইহাই কি সংসার? ইহাই কি বিশ্বপিতার অচিন্ত্যলীলা? যদি ইহা তাঁহার পরীক্ষা হয়, ইহাই তাঁহার লীলা হয়, তাহা হইলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তিনি তাঁহার সৃষ্টি লয় করুন। ক্ষুদ্র মানবের এরূপ কঠোর পরীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা কি? আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত কিছুই ত তাঁহার অবিদিত নাই। তবে আবার পরীক্ষা কিসের? যাহা করিয়াছি—যাহা করিব—যাহা করিতেছি—সকলই ত

তিনি জানেন। তাঁহার অজ্ঞাতে কোন কার্য্য করিবার কাহারও ত সাধ্য নাই। তবে ইহা কি লীলা? এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা দিয়া ফল কি?

দেখিতেছি, ছলনাই এ সংসারের সার। জগতের যাবতীয় বস্তু—স্থাবর জঙ্গম সকলই ছলনা-তৎপর। জীব-শ্রেষ্ঠ মানব ছলনা নিরত। সহোদরে সহোদরে, ভার্য্যায় স্বামীতে, পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, জ্ঞাতি বান্ধবে সকলেই সকলকে কোন না কোন প্রকারে চাতুরিতে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যথায় স্বার্থের ক্রীড়াই সর্ব্বত্র প্রবল—তথায় প্রবঞ্চনা প্রতারণার, চাতুরি ছলনার প্রাদুর্ভাব না হইবে কেন? সংসারের প্রাণীনিচয় ছলনাকারী দেখিয়াই কি সেই মহাচক্রী ছলনা দ্বারা মানব-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন? কে জানে, কি তাঁহার অভিপ্রায়। যদি জানিতাম, আমি তাঁহার চক্ষে নির্ম্মম প্রবঞ্চক, ছলনাকারী স্থির হইয়াছি, তাহা হইলে আমাকে এরূপে দণ্ডিত না করিয়া, ভিন্নরূপে শাস্তি পাইবার নিমিত্ত দিন যামিনী প্রার্থনা করিতাম। শুনিয়াছি তিনি পরম দয়ালু। শুনিয়াছি, কাতর প্রাণে, একাগ্র চিত্তে কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সেই শরণাগত দীনার্ত্তকে বিপন্মুক্ত করিতে তিনি কার্পণ্য প্রকাশ করেন না। তবে আমার প্রতি তাঁহার দয়া হইতেছে না কেন? *Hermous*

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন হে পাপিতারণ, দীনশরণ, মধুসূদন! হে সত্যস্বরূপ নারায়ণ নিরঞ্জন! আজি প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতেছি—এ অধম পাপীকে উদ্ধার কর—আমার সেই প্রাণের প্রাণকে যাহাতে দেখিতে পাই, যাহাতে তাহার সহিত চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইতে পারি—তাহার বিধান কর। আমি পাপী তাপী বলিয়া হে প্রভো! ঘৃণা করিও না। তোমার নাম স্মরণে পাপরাশি

ভস্মীভূত হয় যে! তবে এ অকৃতি সন্তানের উপর সদয় হইবে না কেন? আমি নির্ব্বাণ মুক্তি চাহি না, আমি স্বর্গ চাহি না—আমি চাহি তাহাকে—যে আমার প্রত্যেক ধমনীতে—আমার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

লোকে বলে, কামনাই মহাপাপ। তাঁহাকে নিষ্কাম হইয়া ডাকিতে হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রে সর্ব্ব-কর্ম্মের-ফল শ্রীহরিকে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই জন্যই হিন্দু কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করে। আমি পুণ্যবান নহি—আমি মুক্তি-প্রার্থী নহি। আমি উন্মাদ পাগল—আমি পাপী তাপী, আমার আবার মুক্তি কি? যদি আমার ভাগ্যে মুক্তি থাকিত—তাহা হইলে সে আমাকে ছাড়িয়া যাইত না। আমার ধৃতি স্মৃতি, আমার ধ্যান ধারণা, সকলই সেই। আমি আর কোন স্বর্গ, আর কোন মুক্তি জানি না, জানিতে চাহি না। তাহার সহিত সম্মিলনের তুলনায় সালোক্য, সাযোজ্য প্রভৃতি অতীব অকিঞ্চিৎকর।

শক্তি আরাধনা করিয়াই শিবের শিবত্ব। আমি যদি কায়মনোবাক্যে আমার সেই হৃদয়ের দেবীকে ভাবিতে পারি—তাহারই চিন্তায় অহরহঃ নিমগ্ন থাকিতে পারি—তাহা হইলে তাহাতেই আমার মুক্তি। যত জীব—তত শিব—ইহা কি জান না? জাননা কি সে আমার এখন ভুবনব্যাপিনী মহাশক্তির অন্তর্ভুক্তা হইয়াছে? জাননা কি, তাহার পবিত্রতায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়াছে—তাহার সৌরভে সর্ব্বত্র আমোদিত হইয়াছে? তুমি যদি তাহাকে দেখিতে, তাহাকে চিনিতে, জীবের মর্ম্ম বুঝিতে—তাহা হইলে আমাকে বাতুল বলিতে না। প্রেমের নিদান—প্রণয়ের উৎস—প্রীতির আধার—শ্রদ্ধার

আকর—ভক্তির প্রস্রবণ—মায়ার সাগর সমস্তই সে। সে ছাড়া গুণ নাই। সে এখন সগুণ নির্গুণ উভয়ই। তুমি বাতুলের প্রলাপে হাস্য করিতে পার—কিন্তু ইহার মর্ম্ম বুঝিলে, ইহার তত্ত্ব পাইলে কখনই উপহাস করিতে পারিতে না। তখন আমারই মতন তাহার ধ্যান ধারণায় নিরত থাকিতে।

শিব বাতুল হইয়াছিলেন, তাই শক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাই! এজগতে পাগলের মতন পাগল কয়জন হইতে পারে? আশীর্ব্বাদ কর—আমি প্রকৃতই যেন পাগল হইতে পারি। আমার শক্তি যে—তাহাকে যেন পাইতে পারি। আমি তাহা ছাড়া অন্য দেবতা জানি না—অন্য স্বর্গ মানি না—অন্য মুক্তি চাহি না। আমি চাহি তাহাকে—যাহাকে আমার প্রাণের ভিতর হইতে আমার অন্তরাত্মা প্রতিনিয়ত করুণস্বরে—কাতর ভাবে ডাকিতেছে—যাহার সহিত সম্মিলনের নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। সেই আমার গায়িত্রী—সেই আমার ইষ্টদেবী, সেই আমার লক্ষ্মী—সেই আমার দশমহাবিদ্যা, সেই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার জন্য তোমরা আমাকে যাহা বলিতে হয় বল—আমি তজ্জন্য সুখী বা দুঃখী নহি। আমি সংসারে কাহারও সুখ চাহি না—কাহাকেও জানি না চিনি না। আমি তাহারই মুখাপেক্ষী ছিলাম—তাহাকেই জানিতাম, চিনিতাম; সুতরাং তোমাদিগের প্রশংসা গ্লানি, তোমাদিগের হাস্য পরিহাস আমার নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়!

সম্বন্ধ নির্ণয়।

যাঁহারা আমাকে বুঝাইতে আইসেন, তাঁহারা বলেন যে, তুমি কে, সে কে? তুমি কোথায় ছিলে, সে কোথায় ছিল? তুমি কোথায় যাইবে, সে কোথায় গিয়াছে? ইহার কি কিছু স্থিরতা আছে? সম্বন্ধ জীবনাবধি। যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিনই সম্বন্ধ। নতুবা "কাকস্য পরিবেদনা"। মরিলে কেহ কাহারও সঙ্গে যায় না, মরিলেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। এরূপ স্থলে "আমার আমার" করিয়া শোকমগ্ন হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। যেমন দুই খণ্ড কাষ্ঠ স্রোত-বেগে নদীবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে মিলিত হয়, আবার পলক্ষণেই—স্থানান্তরিত—হইয়া কে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার স্থিরতা থাকে না, মানব জীবনেও লোকের সহিত তদ্রূপ মিলন ও বিচ্ছেদ হয়। কাল সাগরে ভাসিতে ভাসিতে দুইজনে এক হইয়াছিলে—আবার কাল সাগরেই ভাসিতে ভাসিতে দুইজনে কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যাইবে—কেহ তাহার সন্ধানও পাইবে না। এই অনিত্য সংসারে সকলই অনিত্য, চির স্থির কিছুই নহে। সুতরাং অনিত্যের নিমিত্ত—ক্ষণস্থায়ীর নিমিত্ত—দুঃখ বা শোক করা জ্ঞানী মনুষ্যের উচিত নহে।

কথাগুলি শুনিতে ভাল। কিন্তু মন কি বুঝে? এই জন্য রাবণ বলিয়াছিলেন,—

"জানি হে সারণ! এ সংসার মায়াময়
তবু, জেনে শুনে কাঁদে অবোধ পরাণ।"

হে জ্ঞানী মহাপুরুষ! তুমি আজি আমাকে প্রবোধ দিতে আসিয়াছ, কিন্তু বল দেখি তুমিই কি এ সকল প্রবোধ বচনের অর্থ বুঝ? মহামুনি ভরত হরিণ পুষিয়াছিলেন। অন্তিম শয্যাতেও সেই হরিণ স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি তাহার চিন্তা ছাড়িব কি করিয়া? তাহার চিন্তা পরিত্যাগ করিবার আমার অধিকার বা শক্তি নাই। আর সেই চিন্তাতেই ত তাহাকে লাভ করা সম্ভবপর। এমন সুখ চিন্তা ত্যাগ করিতে কাহারও পরামর্শ বা উপদেশ দেওয়া উচিত নহে।

তাহার পর তাহাতে আমাতে সম্বন্ধ ছিল। পঞ্চভূতে সে সৃষ্ট, আমিও গঠিত। উপাদান এক। পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আমারই ন্যায় সে সংসারে আসিয়াছিল। প্রভেদ ছিল—শুদ্ধ অবয়বের—আকৃতির। তাহার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে, আমারও হইবে। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে পঞ্চভূত ব্যতীত যখন আর কিছুই নাই। তখন তাহাতে আমাতে নিকট সম্বন্ধ নাই কি? পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে- জীবন, বিশ্লেষণে—মৃত্যু। ভূত কখন লয় পায় না। ঘনীভূতই থাকুক, আর তরলীকৃতই হউক, আমার শরীর ও মনের উপর তাহার আধিপত্য আছেই! আমি যদি পঞ্চভূতে সৃষ্ট না হইতাম, যদি স্বতন্ত্র কোন উপাদান আমাতে থাকিত, তাহা হইলে তোমার "কাকস্য পরিবেদনা" বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম। কিন্তু তাহা ত নহে। সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় বটে, কিন্তু ভূতের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, নিত্য। আমি তাই বলিতেছিলাম, তুমি যাহাকে অনিত্য বল আমি তাহাকে নিত্য বলি।

সম্বন্ধ নিত্য। আমি তাই প্রত্যেক ধূলিকণায়, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে তাহার সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। আজি আমি যে ভুবন

ভ্রমণ করিতেছি, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছি. ইহার মর্ম্ম তুমি অপ্রেমিক—কি বুঝিবে? বুঝিয়াছিল ধ্রুব, বুঝিয়াছিল প্রহ্লাদ। সে যে এখন পরমাত্মায় লীন হইয়াছে। সে যে এখন স্বয়ং পরমেশ্বরী। প্রত্যেক পরমাণুতে তাহার সত্তা আছে। হিন্দু এ কথার মর্ম্ম বুঝে। হিন্দু তাই তেত্রিশ কোটী দেবতা মানে। বৃক্ষ, শীলা নদ নদী, গ্রহ উপগ্রহ যাহা কিছু নয়নগোচর হয়, হিন্দু তাহার নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়। সেই মহাশক্তির আবির্ভাব সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুর জ্ঞান সীমাবদ্ধ নহে, হিন্দু অসীম অনন্ত মহাশক্তির উপাসক! হিন্দু তাই সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান মানে। আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও এক্ষণে সর্ব্বব্যাপিনী। তাহার শক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে পরিতাপের বিষয় এই, আমার এই জ্ঞান সর্ব্বদা থাকে না। যখন হয়, তখন ধূলারাশি, চিতাভস্ম অঙ্গে লেপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করি। তাহার সহিত যখন আমার একত্ব অনুভূত হয়, তখন পরমানন্দ-রস সাগরে নিমজ্জিত হই, আত্মহারা হই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ ভাব বহুক্ষণ থাকে না, যদি থাকিত, তাহা হইলে আজি দ্বারে দ্বারে তাহার জন্য রোদন করিয়া বেড়াইতাম না। তোমার আত্মা পরমাত্মা; মনঃপ্রাণ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যের কথা বুঝি না। বুঝি—এই চরাচরাদি পঞ্চভূতে সৃষ্ট, এক মহাশক্তির দ্বারা পরিচালিত। সেই মহাশক্তির ও পঞ্চভূতের আক্ষেপণে ও বিক্ষেপণে কাঠিন্য—কোমলত্বে—মরণ জীবন ঘটিয়া থাকে।

মনুষ্য জীবন জলবুদ্বুদের প্রায়। স্রোতস্বিনীবক্ষে পবন হিল্লোলে বুদ্বুদ উঠে। নীর হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন কর—দেখিবে তাহার বুদ্বুদত্ব থাকিবে না। যতক্ষণ সে সলিলে, ততক্ষণ তাহার বুদ্বুদত্ব সম্ভবপর, সুতরাং জলের সহিত তাহার নিকট সম্বন্ধ। মনুষ্য জীবনও

ঠিক এইরূপ; কালসাগরে উঠে আবার কাল সাগরেই মিশিয়া যায়। সুতরাং তাহার সহিত আমার নিকটসম্বন্ধের পক্ষে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

সে আমার আত্মার আত্মা—সে আমার শোণিতের শোণিত। তাহার বিরহে প্রাণ কাঁদিবে বিচিত্র কি? আজি উদাস প্রাণে তাহারই জন্য বিচরণ করিতেছি। তাহারই অভাবে সমস্ত শূন্যময় দেখিতেছি, আমার আমিত্বের অভাব অনুভব করিতেছি। তাহাতে আমাতে পার্থক্য ত কিছুই নাই, ছিল না। সে আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, জীবন মরণের সঙ্গিনী যে! তাহাকে কোথায় ফেলিলাম, কোথায় হারাইলাম? তাহার বিহনে আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না, কর্ণে শুনিতে পাইতেছি না, আত্মা বিকল হইয়াছে। তাহার বিরহে মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে—চরাচর লুপ্ত-প্রায় বলিয়া মনে হইতেছে। আমার এমন সে কোথায় গেল? যদি আমার কোন অপরাধে সে চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আসিয়া তাহা বলুক না কেন? আমি আর কখন তাহার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিব না, প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আর একবার সে আসুক, আর একবার সে দেখুক। এবার কোন অপরাধ, কোন ত্রুটী পাইলে সে যেন চিরদিনের নিমিত্ত ছাড়িয়া যায়। সকল অপরাধের ত ক্ষমা আছে। সে যে আমার দয়া-দাক্ষিণ্য-পূর্ণা, সে যে আমার গুণবতী। সে কি দয়া করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবে না?

আমি তাহার রূপ গুণে ভুলি নাই। তাহার আকৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসি নাই। আমি ভালবাসি, এইমাত্র জানি। কেন ভালবাসি, তাহা জানিবার অবসর পর্য্যন্ত পাই নাই। এই যে সে আমার মুখ চাহিল না, অনুমতির

প্রতীক্ষা করিল না, ফিরিয়া দেখিল না—চলিয়া গেল; এই যে এত কাঁদিতেছি—এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—তথাপি সে আসিতেছে না, দেখিতেছে না—ইহাতে কি তাহার উপর আমার তিলমাত্র রাগ বা বিরক্তির উদ্রেক হইতে পারে? তাহার উপর কথন প্রকৃত কোপ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই—এখন ত পারিব না-ই। কেন, তাহা জান? তাহাতে আমাতে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে যে! মানুষ আপনার উপর আপনি কখন অভিমান ক্রোধ, দুঃখ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে কি? তবে তাহার উপর পারিব কিরূপে? সে যে আমার নিজের আত্মা অপেক্ষা অধিকতর আদরনীয়া—সে যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব। তাহাকে পাইয়া এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার ত্রিদিব অপেক্ষাও সুন্দর হইয়াছিল। তাহাকে পাইয়া মনুষ্য জীবনের মধুরতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তাহাকে পাইয়া মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। সেই আমার এ মরু জীবনে শান্তির সুধাধারা প্রবাহিত করিয়াছিল। পথের কাঙ্গালকে কুড়াইয়া সেই ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন করিয়াছিল। প্রকৃতি না থাকিলে পুরুষের কোন ক্রিয়া থাকে না। একের বিহনে অন্য জড় অচেতন পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই জন্যই বলি তাহাতে আমাতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

এ সম্বন্ধ অতি নিকট; এ বন্ধন ত্যাগ হইবার নহে। ইহা প্রাণে ওতঃপ্রোত ভাবে—বিজড়িত। যতদিন বাঁচিব, তাহার অভাব অনুভব করিব। চিরসম্বন্ধ না হইলে এই অভাব, এই শূন্যতা অনুভূত হইত কি? মৃত্যুর পর কি হইবে, এমনই অভাব থাকিবে কিম্বা যাইবে? তাহার সহিত সম্মিলন হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই। তবে যত দিবস এ দেহে জীবন আছে, যত

দিবস হস্তপদাদি-বিশিষ্ট মানব নাম ধারণপূর্ব্বক সচেতন জীবের ন্যায় সংসারে বিচরণ করিব—তত দিবস তাহার অভাব, তাহার কাহিনী—তাহার প্রেমালোচনা—তাহার প্রীতি ভক্তি, তাহার সমস্তই আমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিবে। তুমি স্বর্গের অপ্সরী—অথবা দেবকন্যা। আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি রূপাকার ঐশ্বর্য্যরাশি আমাকে প্রদান করিতে অগ্রসর হও—তুমি অমৃতভাণ্ড প্রদানার্থ উদ্যত হও, আমি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিব না। তাহার তুলনায় ঐ সকল অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য।

তুমি কি আমার প্রাণের ব্যাকুলতা, ভাবের গম্ভীরতা বুঝিতে পার? বুঝিতে পার কি প্রণয়ে কি মধুর হিল্লোল প্রবাহিত হয়, হৃদয়ে কি নন্দনকাননের সৃষ্টি হয়, কি স্বর্গীয় সুষমারাশির উদয় হয়, কি পুণ্যতোয়া মন্দাকিনীর আবির্ভাব হয়—কি পবিত্র স্বর্গীয় আলোক উদ্ভাসিত হয়? তুমি কি জান, এই প্রীতি প্রফুল্লতা, এই প্রেমভক্তি জগতে দুর্লভ? তুমি কি জান যে ইহার আস্বাদন পাইয়াছে, যে ইহার কণামাত্রের অধিকারী হইয়াছে, সে অমর হইয়াছে। যদি জানিতে, বুঝিতে, তাহা হইলে ভাই! আমাকে বুঝাইতে আসিতে না।

তুমি বলিতে পার যে, আমি স্বার্থান্ধ; ভালবাসার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ। কারণ প্রকৃতপ্রেম জন্মিলে—আমি তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইতাম না—হৃদয়-মন্দিরে তাহার যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই ধ্যান ধারণায় নিরত থাকিতাম। ভাই! আমি ভালবাসা জানি না সত্য। ভালবাসার মতন ভালবাসিতে পারিলে সে কি আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে পারিত? ভবানীপতি যখন সতীর দেহ-ত্যাগের সংবাদ পাইলেন—দক্ষ যজ্ঞালয়ে সতীর মৃত-দেহ পতিত

দেখিলেন—তখন তিনিও সেই পঞ্চভৌতিক দেহের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই—সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তাহার পর বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছেদিত হইলে যোগেশ মহাযোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আমি তুচ্ছ মানব, কীটাণুকীট। আমি তাহাকে ভুলিব—তাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা, তাহার সহিত সম্মিলনের বাসনা পরিহার করিব—ইহা কি সম্ভবপর?

আমি জানি—সে আমার। আমি জানি সে আমার মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম, জানি সেই আমার ধৃতি স্মৃতি, ক্ষমা মতি, বিদ্যা বুদ্ধি, আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি। সে আমার জীবনগগণে পূর্ণশশী, সে আমার দেহের বল, অন্তরে আত্মা, জীবন মরণের সহচরী। সে ছিল—তাই আমি ছিলাম। আমার হৃদয়ে এখনও তাহার সত্তা অনুভব করিতেছি, তাই এখনও বাঁচিয়া আছি। যাহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ, যাহার বিহনে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? সলিলের সহিত মীনের—বায়ুর সহিত খেচর ভূচর জীবের যে সম্বন্ধ—তাহার সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। যেরূপ বসন্ত সমাগমে পিকবরের কুহু রবে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, কুসুম-সেবিত দক্ষিণানিলে প্রকৃতি সতী মনোহর বেশ ধারণ করে, তদ্রূপ তাহার উদয়ে আমার হৃদয়ে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। সে কি তানে—কি সুরে আমার হৃদয়ের তার বাঁধিয়াছে, তুমি অপ্রেমিক তাহা কি বুঝিবে? কি বুঝিবে—বৃন্দাবনে যমুনাতীরে, ধীর সমীরে, বনমালীর বেণুরবে রাধার প্রাণে কি অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইত? কি বুঝিবে—দিনান্তে বন ভ্রমণান্তে—সীতা দ্রৌপদীর প্রেমসম্ভাষণে শ্রীরামচন্দ্র ও পঞ্চপাণ্ডব কি সুখানুভব করিতেন?

সীতার পাতাল প্রবেশ—দ্রৌপদীর দেহত্যাগ, রামচন্দ্র ও পাণ্ডবগণের পক্ষে কত কঠিন প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহা যদি তুমি বুঝিতে, তাহা হইলে আমার ন্যায় তোমাকেও আজি হাহাকার করিতে হইত। সে যে তোমারও আপনার ছিল। সেত কাহাকেও পর বলিয়া জানিত না। সে যেখানে যাইত—সেইখানে কি মোহ-বন্ধনে সকলকে বাঁধিত—কি মিষ্ট বচনে সকলকে ভুলাইত—তাহা তাহার সংশ্রবে যে আসিয়াছে, সেই জানে।

সে যে উদার ছিল। সুতরাং বসুধাস্থিত সকল প্রাণীকেই যে তাহার কুটুম্ব—আত্মীয় বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণু বিশ্বের অণু পরমাণুর সহিত সংমিশ্রিত ছিল। সে আপনা বিকাইয়া ভালবাসিতে জানিত। সেই কৃষ্ণভ্রমরলাঞ্ছিতকেশদাম, সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রললাট, সেই কুরঙ্গ-গঞ্জিত আকর্ণ নয়নযুগল—সেই কামের শরাসন তুল্য ভ্রূযুগল—সেই কোমল, মধুর, স্বর্গীয়-ভাবপূর্ণ কটাক্ষ, সেই তিলফুল-জিনি নাসিকা—সেই বিম্বাধর ওষ্ঠ, সেই বিকচ-নলিনী-সদৃশ আনন, সেই সুন্দর সুঠাম গঠন, যে দেখিয়াছে, সেই দেবী জ্ঞানে তাহাকে সম্ভাষণ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। সে দেবী-প্রতিম ছিল। তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের কুভাবনিচয় দূরে পলাইত, প্রাণে একরূপ স্বর্গীয় পবিত্র ভাবের সমাবেশ হইত! অহো! সেই অলোকসামান্যা ধন্যা রমণী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে, আর আমি এখনও জীবিত আছি!

ইহাকেই কি বিধাতার ইচ্ছা বলে? এমন বিধাতাকে দেখিতে পাইলে, তাঁহার ইচ্ছার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লই। ঐ যে বৃদ্ধা প্রাণের ধন, নয়নের মণি, জীবনের একমাত্র সম্বল পুত্ররত্নকে হারাইয়া কাঁদিতেছে—

ঐ যে কামিনী নারীজন্মের সার, পরমারাধ্য পতির বিয়োগে অধীরা হইয়া বসনাঞ্চলে প্রতিনিয়ত অশ্রুধারা মুছিতেছে—ঐ যে নর নারী ভ্রাতা ভগিনী, জনক জননী, দুহিতা পুত্র—আত্মীয় স্বজন বিয়োগে কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছে—অকাল-মৃত্যুজনিত হাহাকারে দিগন্ত পরিপূরিত করিতেছে, ইহা মঙ্গলময়ের কোন্ ইচ্ছায় ঘটিতেছে? ইহাতে তাঁহার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে? জ্ঞানহীন দুর্ব্বল মানব আমি বুঝিতে পারি না—দেখা হইলে একবার জানিয়া লই।

তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তিনি দাতা, আমি গৃহিতা। তিনি দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াছেন। তবে বৃথা অনুযোগ করি কেন? তিনি যে দয়া করিয়া আমার সহিত তাহাকে চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট।

এই সম্বন্ধ নির্ণয় লইয়াই যত গোলযোগ। সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে যে প্রসাদ লাভ করা যায়, তাহা অমৃত অপেক্ষা মধুর। আমরা সম্বন্ধ নির্ণয়ে অক্ষম, তাই কাঁদিয়া বেড়াই, মোহান্ধ জীবের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যেক মানব পল অনুপলে মরিতেছে, আবার বাঁচিতেছে। এত মরণেরই জগত। এ দেশে মৃত্যু বিচিত্র ব্যাপার নহে। জীবনই আশ্চর্য্যের বিষয়। মরই আর বাঁচই, নিদ্রিত হও আর জাগ্রতই থাক, তোমার অস্তিত্ব কখনই বিলুপ্ত হইবে না। তুমি আদিতে ছিলে, মধ্যে আছ, অন্তে থাকিবে। সকলেরই এই গতি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইবার কাহারও সাধ্য নাই। সুতরাং পরস্পরে যে চিরসম্বন্ধে বদ্ধ—পরস্পরের সম্পর্ক যে চিরস্থায়ী, তাহাতে আর ভুল নাই।

বিস্মৃতি।

স্মৃতি ভাল, কি বিস্মৃতি ভাল? প্রকৃত প্রেমে বিস্মৃতি আছে কি? আমি ত তাহাকে ভুলিতে ইচ্ছা করি না। অপিচ সে যাহাতে আমার মানসপটে অহোরাত্র বিরাজিত থাকে, তাহারই মূর্ত্তি, তাহারই কথা বাক্য যাহাতে হৃদয়ে সতত উদয় হয়, তজ্জন্য যত্নবান হই। তাহাকে বিস্মৃতি-সাগরে নিক্ষেপ করা অসম্ভব। ভুলিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে অধিকতর পরিস্ফুটভাবে মনে হয়।

বিস্মৃতি অপেক্ষা স্মৃতিতে সুখ। তাহাকে ভুলিলে আমার মনুষ্যত্ব ত ঘুচিয়া যায়। তাহাকে ভাবিতে পারিতেছি, তাহার চিন্তা করিতে পারিতেছি, ইহাতে কি-যেন-কেমন একরূপ ক্লেশমিশ্রিত সুখ আছে। অমৃত ও গরলের একত্র সমাবেশ যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে ইহাতেই আছে। বিস্মৃতিতে ত এ অপূর্ব্ব ভাবসমন্বয় হয় না! স্মৃতি আছে, তাই তাহার সহিত কথা কহিবার, তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হয়। স্মৃতি না থাকিলে এ দিদৃক্ষা থাকিত কি? তুমি যদি স্মৃতির নিন্দা কর, তাহা হইলে তোমাকে অরসিক, অপ্রেমিক বলিব।

লোকে বলে, কালে সমস্তই বিলুপ্ত হয়। এই যে প্রাণের পুত্তলি সন্তান, এই যে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা স্বামী—এ সকলের বিয়োগেও হিন্দুরমণী ত ধৈর্য্য ধরে। প্রথমে মনে হয়, ইহাদিগের মৃত্যুতে বুঝি প্রাণ থাকিবে না। কিন্তু প্রাণ থাকে; তাহার পর ধীরে ধীরে—তিল তিল করিয়া মহাকাল সেই শোকরাশি গ্রাস করিতে থাকে। আমি মনে

করিয়াছিলাম, আমারও তাহাই হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিধাতা আমার ভাগ্যে ভিন্ন নিয়ম প্রকটিত করিয়াছেন। আমি তাহাকে আদৌ ভুলিতে পারি নাই। বরং যত দিন যাইতেছে, তাহার বিরহাগ্নি ততই জ্বলিয়া উঠিতেছে; ততই বুঝিতেছি, আমি শক্তিহীন হইয়াছি। তাহার অভাব, তাহার বিচ্ছেদ ক্রমে প্রবলতর হইয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে।

আমি ইহাতে দুঃখিত নহি—বরং সুখী। আমার নিকট তাহার স্মৃতি অপেক্ষা অধিকতর মধুর আর কিছুই নাই। অন্যমনস্ক হইবার জন্য যদি কখন বিষয়ান্তরের চিন্তা হৃদয়ে বলপূর্ব্বক উদয় করাইতে যাই, তাহা হইলে প্রাণের ভিতর হইতে সে যেন মৃদু তিরস্কারচ্ছলে বলে, "ছি! ছি! তোমার নিকট আমার চিন্তা অপেক্ষা অন্য চিন্তা কি মধুর?" অমনি অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে—মনে হয় কি মহাপাপই করিতেছিলাম।

সে গিয়াছে। কতকাল চলিয়া গিয়াছে। সংসারের কত পরিবর্ত্তনই হইল। আমারও কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাহার চিন্তার পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই মুখখানি সদাই মনে পড়ে। তখন পড়িত, এখনও পড়ে। বিবাহের পর সেই ব্রীড়াবনতমুখী বালিকার সরলতাপূর্ণ সুন্দর আস্য—তাহার উপর যৌবনের সেই কমনীয় মনোহর প্রেমপূর্ণভাব—সে কি ভুলিবার? তাই! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিতে পারি, পৃথিবীর যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য ভুলিতে পারি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি—কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারি না—পারিব না। তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র।

তুমি কি জান সে আমার কোথায় ছিল? যদি বাহ্যজগতে

তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতাম, আমার ধমনীতে, শিরায়, স্নায়ু-মণ্ডলীতে তাহার সমস্ত অবয়ব না মিশাইতাম, যদি তাহারই প্রেমমন্ত্রে অনুপ্রাণিত না হইতাম, তাহা হইলে তাহাকে বরং একদিন বিস্মৃত হওয়া সম্ভবপর হইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। সে প্রকৃতই আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী হইয়াছিল। সুতরাং এ দেহ থাকিতে, এ প্রাণ থাকিতে তাহাকে কখনই ভুলিতে পারিব না।

হউক—কালসর্ব্বংসহা। তোমার কালের প্রভাব এখানে প্রতিহত। এ স্বর্গে মর্ত্ত্যের নিয়ম খাটে না। এ স্বর্গে চিরবসন্ত বিরাজিত। তোমার যাহা পরিবর্ত্তনশীল জগত—তাহা এ স্বর্গের অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত। জগতের নিয়ম, পঞ্চভৌতিক দেহের উপর খাটিতে পারে, কিন্তু এ অন্তর্জগতের উপর তাহার কোন আধিপত্যই স্থাপিত হইতে পারে না।

মানুষ ভুলিবার জন্য চেষ্টা করে কেন? ভুলিয়া কি সুখ? হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না। তুমি আজি একজনকে হৃদয়-রাজ্য হইতে অপসারিত করিলে, কল্য আর একজন আসিয়া আবার তোমার হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকিবে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পূর্ণভাবে কোন রমণীই তোমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। এই অপূর্ণ অবস্থায় চিরকাল কাটাইয়া, তোমার হৃদয়-মন্দিরে অসম্পূর্ণ অঙ্কে দেবীকে রাখিয়া তোমার কি সুখ? পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হইলে কোন বস্তুরই শোভা সৌন্দর্য্যের, মিষ্টতা মনোহারিত্বের বিকাশ পায় না। যদি একবার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পার, পূর্ণপ্রেমতরঙ্গে হৃদয়কে নাচাইতে পার—তাহা হইলে উহার মধুর আস্বাদন উপলব্ধি করিতে পারিবে, সংসারে অমর হইয়া থাকিবে। প্রেমে বনের পশু পোষ মানে, খল সর্প বশীভূত হয়।

নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে এরূপ পবিত্র আনন্দদায়ক অমৃতময় প্রেমের পূর্ণ রাসাস্বদনে লোকে বঞ্চিত হয় না।

যেখানে পূর্ণপ্রেম, সেই খানেই অমরত্ব। অমরের কি বিস্মৃতি আছে? স্মৃতি যেরূপই ক্লেশ বা যন্ত্রণাদায়ক হউক না কেন, তাহার সহিত মধুরতার সম্মিলন থাকায়, বড়ই প্রাণারাম হইয়া থাকে। এখন সময়ে সময়ে ভয় হয়, পাছে কাল আবার আমার জীবনের সম্বল এই স্মৃতিটুকুকে পর্য্যন্ত অপহরণ করে। তাহাকে লইয়াও কাল যদি সন্তুষ্ট না হইয়া থাকে, আবার তাহার স্মৃতি হরণে যদি হস্ত প্রসারণ করে, তাহা হইলে আমার প্রাণান্ত হইবে।

সে যে নাই, তাহাত মনে হয় না। আমাকে ছাড়িয়া চিরতরে সে যে পলায়ন করিতে পারে, মনঃ ইহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সদাসর্ব্বদা মনে হয়, সে আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, আমার ভালবাসার গভীরতা দেখিবার জন্য কোন স্থানে সঙ্গোপনে অবস্থান করিতেছে। আমার কাতরতা দেখিয়া সে হাসিমুখে এখনি আসিয়া আলিঙ্গন করিবে। কিন্তু কই সেত আসে না, একবার ফিরিয়াও দেখে না! কত কাল চলিয়া গেল—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর দেখিতে দেখিতে কালস্রোতে বিলীন হইল, আমার সেত আসিল না! সেই সুরম্য হর্ম্ম্য, সেই সুসজ্জিত গৃহ, সেই দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা, সেই বাতায়ন, সেই উপবন, সেই উদ্যানস্থিত পুষ্করিণী, সেই বৃক্ষ লতা, সেই কুসুমনিচয়, সেই পিক কূজন, মধুপঝঙ্কার সকলই রহিয়াছে—কেবল প্রিয়াই নাই। প্রিয়া জল সেচন করিয়া যে বৃক্ষগুলিকে, যে লতাবলীকে জীবিত রাখিয়াছিল, সে গুলি শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের স্থান অন্য বৃক্ষলতা অধিকার করিয়াছে, তথাপি প্রিয়া আসি-

তেছে না! এক এক সময়ে মনে হয়, চন্দ্রাননী উদ্যানের কোন নিভৃত কুঞ্জে লুক্কায়িত আছে। অমনি অন্বেষণ-তৎপর হই। কিন্তু অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে, হতাশ মনে তরুমূলে আশ্রয় লইতে হয়। তবু সে আসে না! সে আসিবে কেন? আমি যে নিতান্ত ভাগ্যহীন। আমি মহাপাপী! সে আসিলে আমার দেহ প্রাণ যে জুড়াইয়া যাইবে, আমি কৃতার্থ হইব যে! বিধাতা দণ্ড দিবার নিমিত্ত আমার প্রতি এ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে সে আসিবে কেন? নাই আসুক, বিরহ বেদনায় আমি মৃতকল্প হইয়া অবস্থান করি, তাহাও সহ্য হইবে, তথাপি প্রিয়া আমার সুখে থাকুক, এ বাসনা আমি ত্যাগ করিতে পারিব না; সে যেন আমার ন্যায় ক্লেশানুভব না করে। বিস্মৃতি যদি তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে আমি সুখী। আমি কিন্তু তাহার স্মৃতি ছাড়িতে পারিব না।

সে যেখানে যেটীকে রাখিয়াছিল, আমি তাহার কোনটীকেই স্থানচ্যুত করি নাই। কিছুতে হস্তার্পণ পর্য্যন্ত করি নাই। ভয় হয়, পাছে আমার স্পর্শে তাহার রক্ষিত দ্রব্যগুলি মলিন বা বিলুপ্ত হয়। সে দেবভোগ্য কুসুম আমারই স্পর্শে বিশুষ্ক হইয়া গেল। সে যদি আমার হস্তে না পড়িত, আমার সংস্পর্শে না আসিত, বুঝি তাহার পরিণাম এরূপ হইত না। সে অযোগ্য পাত্রে পতিত হইয়াছিল, তাই অকালে লয় প্রাপ্ত হইল। আমার মনেত ইহাই হয়। তাই ভয়ে দুঃখে তাহার দ্রব্যগুলিতে, তাহার রোপিত বৃক্ষগুলিতে হস্ত প্রদান করি না। সে যদি আমার জন্যই পলায়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এই প্রিয়বস্তুগুলির জন্য ফিরিয়া আসিতেছে না কেন? দ্রব্যগুলি ধূলিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৃহের শোভা বিনষ্ট হইয়াছে, বৃক্ষ লতা আদি

বিহনে বিশুষ্ক হইয়াছে, তাহার পোষা পাখীগুলির মধ্যে কতকগুলি মৃত কতকগুলি অৰ্দ্ধমৃত হইয়াছে, এ সকল কি সে দেখিতে পাইতেছে না! আমার মায়া, আমার ভালবাসা যদি সে ভুলিতেই পারিয়া থাকে, তাহার এত সাধের বস্তু গুলির প্রতি ভালবাসা লোপ পাইল কেন? গৃহের চিত্রাদি, উদ্যানের বৃক্ষাদি, পিঞ্জরের পাখিগুলি ত পাপের পসরা মস্তকে লইয়া সংসারে আসে নাই? তাহাদিগের উপর তাহার ক্রোধ বা অভিমান হইল কেন?

এখন বুঝিতেছি সে আর আসিবে না। সে দেশে যে যায়, সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না, অথবা করিবার তাহার শক্তি থাকে না। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, সেত গিয়াছে। এখন সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তাহার মধুর স্মৃতি যেন আমাকে কখন ত্যাগ না করে। আমি তাহার স্মৃতি লইয়াই বাঁচিয়া আছি। তাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইলে আমার জীবনান্ত হইবে। তুমি আমাকে যদি জীবন বিসর্জ্জন করিতে বল, তাহা হইলে বিস্মৃতির আরাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিও।

বাসর।

আজি আমার বাসর। আজি বাসরে বরবেশে বসিতেছি। এমন দিন আর হইবে না। সেই এক দিন, আর এই একদিন। সে অনেক দিনের কথা। যে দিন শুভসম্মিলন হইয়াছিল, যে দিন চারিচক্ষে মিলন হওয়ায় ব্রীড়াবনত মুখে, সলজ্জভাবে প্রিয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়াছিল, সেই একদিন। সে বাসরে কত রমা নানারূপে আলাপন করিয়াছিল। সে বাসরে কত সাজ সজ্জা, কত সমারোহ ঘটা, কত নৃত্য গীত, কত আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সে বাসরের কথা আজি পুনরায় মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে—সে রাত্রিতে মনে করিয়াছিলাম মর্ত্তে আমি নবজীবন লাভ করিলাম। সে বাসরে আমার হৃদয়ে যৌবন-সুলভোচিত কত বিলাস বিভ্রম, কত প্রণয় প্রীতির আবির্ভাব হইয়াছিল। কে যেন সে দিবসে আমাকে মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিল। কে যেন ক্ষীণ অগভীর নদীতে জলপ্লাবন ঘটাইয়াছিল। কে যেন আমার হৃদয়-কাননে মধুমাসের মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; হৃদয়ের মুকুলিত বৃত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; পঞ্চমতানে কোয়েলার স্বর কর্ণ রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। হায়, সে দিন গিয়াছে! সে দিবসে যে দেবীর আবির্ভাবে—যাহার আবাহনে আমার দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইয়াছিল—ক্ষীণ-প্রাণ বাঙ্গালী কি এক স্বর্গের শোভা দেখিয়া মহোল্লাসে সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম—সে দেবীর বিসর্জ্জনে, সে দেবীর তিরোধানে আজি আবার বাসর সাজাইয়াছি, আজি আবার বাসরের পুণ্যাহিনয়ে ব্রতী হইয়াছি।

এ বাসর সজ্জা অপূর্ব্ব—অদ্ভুত। ইন্দ্রিয় নিরোধ কর, প্রকৃতি বিকল কর—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল কর—অনন্যমনে—একাগ্রচিত্তে তাহাকে ভাব, তাহারই চিন্তায় ডুবিয়া যাও। দেখিবে তোমার হৃদয়ে কি মনোমুগ্ধকর বাসর-সজ্জা হইয়াছে। দেখিবে, হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, পুরুষ প্রকৃতি আজি রাসমঞ্চে চিত্তবিমোহন রূপে কেলি করিতেছে। যাহার অভাবে এত কাতর হইয়াছিলে—যাহার অভাবে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেছিলে, আজি সেই পূর্ণ মূর্ত্তিতে তোমার হৃদয়াসনে আবির্ভূতা হইয়াছে। কি মনোহর রূপ—কি অপূর্ব্ব কান্তি! কি চমৎকার লীলা!! যে দেখিয়াছে, সেই মজিয়াছে, সেই মরিয়াছে। এস ভাই সত্বর এস—এমন ভুবনমোহিনী বাসরলীলা আর কখন নয়নগোচর হইবে না। কেলীকুঞ্জে এমন কৃষ্ণ রাধিকার ক্রীড়া দেখিয়া আর কখন দেহ প্রাণ সার্থক করিতে পারিবে না।

আজি আমার বাসর! হরি! হরি!! যাহাকে পাইবার নিমিত্ত কত সাধ্য সাধনা করিলাম, যাহার জন্য অনবরত চক্ষেরজলে বক্ষ ভাসাইয়াছিলাম, যাহাকে হারাইয়া উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলাম, আজি আমার সেই প্রাণের প্রাণ—অন্তরের অন্তরকে পাইয়াছি, আজি নবরূপে নবসাজে নায়িকা আসিয়াছে।

এ যোগে বিয়োগ নাই। এ বন্ধন ছিন্ন বা শিথিল হইবার নহে। এ শান্তি নষ্ট হইবার নহে। তোমরা আমাকে পাগল বা যথেচ্ছ শব্দে অভিহিত কর—আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিব না; আজি আমার মাহেন্দ্রক্ষণে মহাযোগ উপস্থিত। সে এক শুভদিন, আজি এক শুভদিন; সে এক বরবেশ, আজি এক বরবেশ। সে দিবসও প্রিয়া-প্রাপ্তি উদ্দেশ্য ছিল, অদ্যও তাহাই। পার্থক্যের মধ্যে বেশের

বিভিন্নতা, সমারোহের পৃথকতা, প্রথার তারতম্য। সে দিবস পুরাঙ্গনা-গণ আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন, আজি রোদন করিতেছেন। সে দিবস মনুষ্যবাহকে চতুর্দ্দোলে লইয়া গিয়াছিল, অদ্যও মনুষ্যবাহকে চতুর্পায়া-সমন্বিত খট্টাঙ্গে লইয়া যাইতেছে। সে দিবস পরিণয়ের সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছিল, অদ্যও সোত্তরীয় নববস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। সে দিবস সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়াছিলাম, অদ্য ঘৃতাক্ত কলেবরে স্নান করিব। সে দিবস কারুকার্য্য-মণ্ডিত মণি-মুক্তাদি-খচিত বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিয়াছিলাম, আজি আমার যে আসন, যে বাসর-গৃহ, ইহাতে উপবেশন কালে ধনী, নির্ধন, পুণ্যাত্মা পাপী কাহারও সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকে না। এমন পবিত্র গৃহ, এমন পবিত্র আসন পৃথিবীতে আর নাই।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে, নীরব নিস্পন্দ শরীরে শবশিব হইলে এ বাসরের কার্য্য সমাধা হয়। চিতাশয্যায় শয়ন করিয়া, অগ্নিদ্বারা দেহাদি পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার সকাশে যাইতে হয়। এমন যাত্রা, সামান্য সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। এ প্রস্থানের তুলনা নাই, এ প্রস্থানের পর আর প্রত্যাবর্ত্তন নাই। লক্ষ্যহীন জ্ঞানবিরহিত, রিপুবর্জ্জিত, নিষ্কাম কায়া লইয়া বাসরের শোভা সম্পাদন করিতে যাইতেছি। আমার এই আনন্দের দিনে—আমার এই শুভ সম্মিলনের সুযোগে তোমরা কেহ কাঁদিও না। আজি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনের দিবস। সেও আমার এমনই করিয়া এই শয্যায় অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন যায়—তাহার বদনে হাস্য প্রকটিত ছিল। আমিও হাসিতে হাসিতে মিলনের পথে যাইতেছি। তবে তোমরা কাঁদিবে কেন? ওই দেখ সেই নিসর্গ সুন্দরী—সেই দেবী—গগণ প্রান্ত হইতে

আমাকে হস্তদ্বারা আহ্বান করিতেছে। ঐ দেখ সেই লাবণ্যময়ীর অঙ্গের মধুর সৌরভে দিক্‌দিগন্ত পরিপূরিত হইতেছে। ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। তোমরা আজি প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় খুলিয়া হরি হরি বল। "হরি বোল, হরি বোল" এই মধুর নামের ডঙ্কা বাজাইয়া আমি যাইতেছি। আমার আনন্দ উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। সে বাসরে তাহাকে পাইয়াছিলাম, এ বাসরেও আবার শুভ সম্মিলন হইবে। এ মিলনে বিচ্ছেদ নাই—ইহা অবিমিশ্র সুখনিদান।

যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলাম, আপদ মস্তক যাহার চিন্তায় পূর্ণ ছিল—শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে যাহার ধ্যান জ্ঞান হৃদয় মন অধিকার করিয়া থাকিত—যাহার বাক্যামৃত পান জন্য প্রাণ শীতল হইত, যাহার দর্শন লাভাশায় উন্মত্তের ন্যায় চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, আজি বহু ভাগ্যবলে—ভগবৎ কৃপায় তাহাকে পাইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। জগৎপিতা ডাকিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাঁহার আদেশে এই মহাপ্রস্থান। আমার হৃদয়েশ্বরীও তাঁহারই আদেশে এদেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় তাহাকেও যাইতে হইয়াছিল। যে অবস্থায়, যাহার নির্দ্দেশে সে গিয়াছে—সে অবস্থায় তাহারই নির্দ্দেশে আমিও সেই দেশে যাইতেছি। তবে তাহাকে পাইব না কেন? বিবাহের দিবস বাসরে তাহাকে পাইয়াছিলাম, আজি এবাসরেও তাহাকে পাইব—এরূপ আশা হৃদয়ে বলবতী না হইবে কেন?

দেবতা, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, মানব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে যেখানে আছ—আশীর্ব্বাদ কর—যেন মহাপ্রস্থানে—সেই অজানা

দেশে প্রিয়া-সম্মিলনে তাপিত প্রাণ জুড়াইতে পারি। যাহাকে পাইলে সকল দুঃখ পাসরিয়া যাইতাম, যাহার অঙ্গ-সৌরভে আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিত, তাহাকে পাইয়া আনন্দ উপভোগ করিব, সেই অজানা দেশ-বাসী হইব, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আজি সাম্যের রাজ্যে মৈত্রীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইব। সেখানে রোগ শোক, সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, সম্পদ বিপৎ কিছুই নাই। সেখানে চিরশান্তি বিরাজিত। সেখানে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতা পুত্রে, জননী দুহিতায়, স্বামী স্ত্রীতে, বিবাদ কলহ নাই। সেখানে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা—মিত্র-দ্রোহিতা নাই। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই, মাস নাই, বৎসর নাই, আলোক নাই, আঁধার নাই, শব্দ নাই, নিস্তব্ধতা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই। এক কথায় তথায় ঋতুর প্রাদুর্ভাব, ইন্দ্রিয়ের প্রভাব, কিছুই নাই। সে দেশ অপূর্ব—সে দেশ অচিন্ত্য। তেমন মনোহর দেশে যাইতে কাহার না সাধ হয়? বিশেষতঃ যাহার প্রিয়জনবর্গ তথায় পূর্ব্বে গমন করিয়া সুখনিকেতন স্থাপিত করিয়াছে। ভাই সব! হরি বোল, হরি বোল বল। আমার কর্ণরন্ধ্রে ঐ মধুর ধ্বনি প্রবেশ করাও। আজি আমার মহাযোগ উপস্থিত। আজি আমার বড়ই সুদিন। এমন সুদিনে তোমরা প্রাণ ভরিয়া "হরি বোল, হরি বোল" বলিয়া আমার দেহ প্রাণ পবিত্র কর—কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দাও। যাঁহার নাম স্মরণে ত্রিতাপের নাশ হয়, জীব জীবন্মুক্ত হয়, তাঁহার সেই প্রাণারাম চিত্তোন্মাদক নাম সকলে সমস্বরে উচ্চারণ কর। আমার বাসর সজ্জায় যদি কাহারও আনন্দ হইয়া থাকে, যদি কেহ আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমার বাসরে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একবার উচ্চ

কণ্ঠে "হরি বোল" বলিতে বলি। সকলে "হরি বোল, হরি বোল" বল। ঐ নাম শুনিতে শুনিতে, ঐ নাম জপ করিতে করিতে, ইহ ধাম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ে প্রাণপ্রিয়াকে পাইব, সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরে যাইবে। এ বাসরের ইহাই মন্ত্র। এ বাসরের ইহাই কার্য্য। যখন অজ্ঞান অচেতন হইয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হইব—তোমরা চিতাশয্যায় শয়ন করাইয়া আমার সৎকার করিবে, তখন তোমাদেরই প্রসাদে তোমাদেরই কৃপাকণায় আমার পঞ্চভৌতিক দেহ ঘুচিয়া যাইবে। আমি লোকচক্ষুর অগোচরে প্রিয়াসমীপে উপস্থিত হইব। আমার সে বাসর, আমার সে সম্মিলন, আর কিছুতেই শেষ হইবে না।

আজি আমি যে বাসরে যাইতেছি, কল্য তোমাকেও সেই বাসরে যাইতে হইবে। পরশ্ব অন্যকেও এই বাসরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই লীলা, ইহাই অলঙ্ঘ্য নিয়ম। তবে ভাই তুমি অপরের নিমিত্ত কাঁদ কেন? যে কয় দিবস বাসর সজ্জার বিলম্ব হয়, সে কয় দিবস দুঃখ না করিয়া থাকা যায় না সত্য, কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, সময়ের অগ্রপশ্চাৎ ব্যতীত ইহা হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কালের শাসনে সকলকেই এই পথ দিয়া যাইতে হইবে।

বুঝিয়াছি, অগ্নিসংস্কার না হইলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সে দেবলোকে, আমি মর্ত্তধামে। সেখানে অপবিত্রতার লেশ মাত্র যাইতে পারে না। অগ্নি-সংযোগে দ্রব্য সংস্কৃত হয়—অপবিত্রতা দূরীভূত হয়। তাই অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন। আমি আজি আনন্দসহকারে সেই অগ্নিসংস্কারে অগ্রসর হইতেছি, এমন দিন আর হইবে না।

মনে আছে, যে দিবস সে ইহধাম ত্যাগ করিবে, সে দিবস প্রাতঃকালে শীতল সমীরণ সেবনে যখন তাহার পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছিল—তখন মধুর স্বরে সে একবার মাত্র গাহিয়াছিল—

"বড় সাধ করে, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল"।

হায়! কে তাহার সাধে বাধ সাধিল রে? এমন নির্মম, নিষ্ঠুর কে আছিস রে, তাহার বাধা গৃহে অগ্নি প্রদান করিলি? এত সাধের ঘর, এত তৃণলতা-সংগৃহীত আয়াস-সাধ্য গৃহ—এমন লক্ষ্মীর আবাসস্থল, কে ধ্বংস করিলি রে? হে অগ্নিদেব সর্বভুক্ নামের সার্থকতা সম্পাদনের আর কি স্থান ছিল না? যখন তাহার গৃহ দগ্ধ করিয়াছ—তখন আমাকেও তোমার ঐ সর্ব্বগ্রাসের মধ্যে গ্রহণ কর। তোমার দ্বারাই আমার ইষ্ট লাভ হইবে। এই জন্যই লোকে বলে—

"যে মাটীতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে"।

আমি তোমাদ্বারাই পতিত হইয়াছি, তোমাকেই ধরিয়া উঠিব। যে সাধের বাসর তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, সেই সাধের বাসর তোমার কল্যাণেই আবার হইবে। ইহাও তোমার লীলা!

সে যখন বুঝিয়াছিল তাহার কাল সংক্ষেপ হইয়াছে—এত সাধ করিয়া, এত যত্ন করিয়া যে গৃহ সে বাঁধিয়াছে, তাহাতে সে আর থাকিতে পাইবে না—তখন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে ঐ গীত বাহির হইয়াছিল। আমার মর্ম্মে মর্ম্মে উহা প্রবেশ করিয়াছিল। এখনও সেই স্বর—সেই করুণ-রসাত্মক সঙ্গীত আমার কর্ণে নৃত্য করিতেছে। এখনও বোধ হইতেছে, দিক্‌বালাগণ সেই সঙ্গীত লইয়া ক্রীড়া

করিতেছে। সে স্বর কি মর্ম্মস্পর্শী! কি হৃদয়গ্রাহী!! আজি আমারও সেই সময় উপস্থিত। আমিও প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছি—

"বড় সাধ করে এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল"।

এ অনল কেহ নিভাইতে পারিল না। রাবণের চিতানলের ন্যায় এ অনল আবহমান কাল জ্বলিতেছে—জ্বলিতে থাকিবে। আমার পূর্ব্বে, আমার সহিত, আমার পরে, কত লোকে এই বিষাদ সঙ্গীত গাহিয়াছে, গাহিতেছে ও গাহিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি সাধ না থাকিত, যদি গৃহ না বাঁধা হইত, তাহা হইলে ত দুঃখ হইত না। সাধেই দুঃখ। আশা না থাকিলে দুঃখ কোথা হইতে আসিবে? আশা-ভঙ্গের নামই ত দুঃখ। অনল এ দুঃখের মূলীভূত কারণ। কালানলে সকলেই দগ্ধীভূত হয়। আবার মায়াঘোরে সকলেই গৃহনির্ম্মাণ করে। ইহাই প্রহেলিকা।

যে অনল দুঃখদায়ক, আজি সেই অনল আবার আমার নিকট সুখোৎপাদক। এই অনলের গুণেই আমি প্রিয়া-দর্শনে যাইতেছি— এই অনলের প্রভাবেই আমার দেহ মনঃ সংস্কৃত হইতেছে। যাহা সৃষ্টির কারণ, তাহাই নাশের সোপান। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আর নাই।

আজি তোমরা প্রাণ ভরিয়া আমাকে হরিনাম শুনাও। আমার রসনা বিকল হইয়া আসিতেছে, বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তোমরা ঐ নাম গান কর—আমি শুনি। শুনিতে শুনিতে মহানিদ্রায় অভিভূত হই। কারণ উহাই আমার সম্বল। এই ভবনদী পারের অন্য সহায় সম্বল নাই, অন্য কাণ্ডারী নাবিক

নাই। মানুষ আজীবন যাহাই করুক, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যেরূপ চিন্তায় হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তদ্রূপ গতিই লাভ করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাতে ভগবচ্চিন্তার উদয় হয়—সদ্ভাবনিচয় হৃদয় মনঃ অধিকার করে, তজ্জন্যই জীবিত কালে ঈশ্বরের উপাসনা, নানারূপ সদনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। সৌভাগ্যের গুণে সে সময়ে মনোমধ্যে ঐ সকল প্রসঙ্গের উদয় হইতে পারে। আমি যাহাকে ভাবিয়াছি—যাহার চিন্তায় দেহ মনঃ সমর্পণ করিয়াছি, তাহাকে পাইলেই আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে। তাহাকে পাইতে হইলে হরিনাম সম্বল করিতে হইবে। মনুষ্য নিদ্রার পূর্ব্বে যেরূপ চিন্তা করিতে থাকে, নিদ্রিত অবস্থায় প্রায় তদ্রূপই স্বপ্ন দেখে। এ মহানিদ্রাতেও তাহাই বটে। তাই বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার এই সময়ে তোমরা সকলে সমস্বরে "বল হরি, হরি বোল, হরি!" বলিতে থাক। আমার কাণের ভিতর দিয়া ঐ নাম হৃদয়-বাস মধ্যে প্রবেশ করুক। আজি আমার বড় শুভদিন! এমন দিন আর হয় নাই—হইবে না। আজি হরিনাম জপ করিতে করিতে প্রিয়া-সন্দর্শনে যাইতেছি—তোমরা হরি হরি বল।

এ বাসরের এই গানই মধুর—এ ব্রতের ইহাই উদ্‌যাপনের মন্ত্র। পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে লোকে এমন ভাবে বাসরের সাধ মিটাইতে পারে। ধন্য আমি—ধন্য প্রিয়া—ধন্য হরিনাম।

আজি যেস্থানে আমার বাসর-সজ্জা হইয়াছে—সেস্থান অতি পবিত্র। ধরায় এমন পুণ্যস্থান আর নাই। এখানে ঘোর সংসারীরও মায়া মোহের মোচন হয়—বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। এখানে ভূমণ্ডল-বিজয়ী বীরেন্দ্র-কেশরী এবং দুর্ব্বল, ক্ষীণ, পরপদানত, মুকুটধারী

নরপতি এবং পর্ণকুটীরবাসী দীনহীন দরিদ্র, সুস্থ সবলকায় মহা-পুরুষ এবং ব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ব্যক্তি, তপস্যানিরত মহাযোগী এবং ভীষণ পাপী সকলই সমান। একই শয্যায় সকলকেই শয়ন করিতে হয়। এমন সাম্যের রাজ্য আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। আজি এমন স্থানে আমার বাসরসজ্জা। এইস্থান হইতেই মহা-প্রস্থান করিব। এইখানেই প্রিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে—আমারও হইবে। এই মৃত্তিকাতে তাহার ভস্মরাশি পতিত হইয়া-ছিল—আমারও হইবে। এই জাহ্নবী বারিতে তাহার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল—আমারও হইবে। যেমন করিয়া প্রাণেশ্বরী স্বর্গে গিয়াছে—আমিও তেমনি করিয়া যাইতেছি। তবে জানি না, আমার ভাগ্যে স্বর্গ হইবে কি নরক হইবে। যাহাই হউক, যিনি পাঠাইয়াছিলেন—তাহারই আহ্বানে যাইতেছি। পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্যরাশি ঢালিয়া দিলে—লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিলে—আমার এ প্রস্থান নিবারিত হইবে না। যাঁহার আদেশে প্রাণাধিকা গিয়াছে—আমিও তাঁহার আদেশে যাইতেছি—তবে তাহাকে না পাইব কেন? তোমরা প্রাণ ভরিয়া "হরি হরি বল।" আমার পথের সম্বল হউক। আমি এই সম্বল লইয়া তাহার সহিত মিলিত হইব।